রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন।

রাজা পলায়ন করিলেন বটে, কিন্তু চিতোর একবারে রক্ষকশূন্য হইল না। চিতোরের অধীনস্থ রাজপুত সর্দ্দারগণ রাজধানী রক্ষার্থ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। যখন আক্রমণের সময় চিতোর রক্ষার্থ বাপ্পারাওলের বংশীয় (১) কোন রাজপুত্র স্বীয় রক্ত দান না করিলে রাজধানী রক্ষা হইবে না, এইরূপ প্রবাদবাক্য বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল। যখন আলাউদ্দিনঃ প্রভৃত পরাক্রমে চিতোর আক্রমণ করেন, সেই সময়ে লক্ষ্মণ সিংহের দ্বাদশপুত্র চিতোর রক্ষার্থ প্রাণবিসর্জ্জন করিয়া চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর রক্তপিপাসা শান্ত করেন। অল্পকাল মধ্যেই হাম্বির চিতোর উদ্ধার করেন। মালবরাজ বাজবাহাদুর চিতোর আক্রমণ করিলে শিশোদিয়বংশীয় দিওলারাজ স্বীয় জীবন উৎসর্গ করিয়া চিতোর রক্ষা করেন। কিন্তু এইবার রাজা পলায়ন করাতে রাজরক্ত দ্বারা চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর পরিতৃপ্তির আর কোন সম্ভাবনা রহিল না, সুতরাং এইবার মোগল আক্রমণে চিতোর নিশ্চয়ই বিজিত হইবে এইরূপ ভাবিয়া চিতোর-রক্ষী বীরগণ নিতান্ত ম্রিয়মাণ্ হইলেন ; কিন্তু একবারে হতাশ না হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন।

রাজার পলায়নবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া আকবর অসাধারণ বিক্রমে চিতোরের সূর্য্যতোরণ আক্রমণ করিলেন। সহিদাস চন্দওয়ৎ বীরগণের সহিত উক্ততোরণ রক্ষা করিতে লাগিলেন। উভয় পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ উপস্থিত হইল। মোগলগণ রাজপুত অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক অধিক, তথাপি রাজপুত সৈন্য মৃত্যু অবধারিত জানিয়াও পশ্চাৎপদ হইল না। পুনঃ পুনঃ আকবরের অসংখ্য মোগল সৈন্য সহিদাসের স্বল্পসংখ্যক রাজপুতের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল, প্রতি আক্রমণে রাজপুত সৈন্যশ্রেণী ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল, তথাপি কেহ হটিল না। অটল পর্ব্বতবৎ অবস্থান করিয়া রাজপুতগণ মোগল-আক্রমণ ব্যাহত করিতে লাগিল। অব্যর্থ বর্শা চালনে বহুসংখ্যক মোগলকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়া সহিদাস চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

সহিদাসের মৃত্যুর পর ক্রমে ক্রমে অপর রাজন্যগণ জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। প্রথমেই দীল্লীশ্বরবংশীয় কাটারি-রাজ, তৎপরে বিজলি-রাজ প্রমর ফুলেশ্বর এবং সাদ্রিরাজ ঝালাকুলেশ্বর, তদনন্তর ঈশ্বরীদাস রাঠোর চিতোর রক্ষার্থ আপন আপন জীবন বিসর্জ্জন করিলেন। ইহাদের মৃত্যুর পর চিতোর রক্ষার ভার বেদনোরের অধিপতি রাঠোরবংশীয় জয়মল্ল এবং কৈলওয়ার অধিপতি পুত্তের উপর

(১) চিতোরের রাজবংশের আদিপুরুষ বাপ্পা রাওল। ইনি হিন্দুসূর্য্য এই গৌরবাত্মক উপাধি ধারণ করেন, ইহাঁর বংশের নাম শিশোদিয় বংশ।

ন্যস্ত হইল। পুত্তের জননী এবং বনিতা চিতোরে উপস্থিত ছিলেন। অসংখ্য মোগল সৈন্যের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে কিছুতেই নিস্তার নাই, ইহা জানিয়াও পুত্তকে যুদ্ধে যাইতে তাঁহারা নিষেধ করিলেন না। স্বদেশরক্ষার্থ পুত্রের মরণ রাজপুত-জননীর পক্ষে বিশেষ ক্ষোভের বিষয় ছিল না। পুত্ত জননীর আদেশ ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া মুষ্টিমেয় রাজপুত সৈন্য লইয়া অসংখ্য মোগল চমূর সম্মুখীন হইলেন। পুত্তজননী যে কেবল পুত্রকে বিদায় দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন, তাহা নহে। স্বদেশরক্ষারূপ গুরুতর কর্ত্তব্য পালন করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং নিজে যোদ্ধৃ-বেশে সজ্জিত হইয়া ও পুত্রবধূকে রণসাজে সাজাইয়া ভীষণ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তাঁহাদিগের অসাধারণ বীরত্বে মোগল সৈন্য চমকিত হইল। কিয়ৎক্ষণের জন্য বোধ হইল অসংখ্য মোগল-বাহিনী রমণীর বীরত্বে বাত্যাতাড়িত সংক্ষুব্ধ সাগরোর্ম্মির ন্যায় প্রহত ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু অমানুষিক বীরত্ব দ্বারাও তাঁহারা চিতোর রক্ষা করিতে পারিলেন না। স্বদেশরক্ষার্থ প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া ইতিহাসে অলন্ত কীর্ত্তি রাখিয়া ক্রমে ক্রমে পুত্ত, তাঁহার জননী ও বনিতা যুদ্ধে হত হইলেন। তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গেই চিতোর রক্ষার সমস্ত আশা বিলুপ্ত হইল। জয়মল্ল আকবরের স্বহস্ত-নিক্ষিপ্ত গুলিতে আহত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তৎপরে কঠিন জহরব্রত নির্ব্বাহিত হইল। রাজপুত মহিলাগণ পবিত্রতা রক্ষার্থ জ্বলন্ত চিতায় আরোহণ করিয়া জীবন বিসর্জ্জন করিলেন এবং আকবর বাদশাহ শূন্য চিতোর নগরী অধিকার করিলেন। বারান্তরে জহর-ব্রতের বিবরণ পাঠিকাগণকে উপহার দিবার ইচ্ছা রহিল।

বঙ্গদেশে কোন পাঠিকাকে বোধ হয় কখনও যুদ্ধে যাইতে হইবে না, কিম্বা যুদ্ধে-গমনোন্মুখ পুত্রকেও বিদায় দিতেও হইবে না, তবে কখন কখন কঠিন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের আবশ্যকতা হইয়া পড়ে। সেই সময়ে কর্ত্তব্যের কঠোরতার বিষয় চিন্তা করিয়া তদনুষ্ঠানে বিরত হওয়া উচিত নহে। কর্ত্তব্যপালন মনুষ্যের প্রধান ধর্ম্ম, ইহা সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। সংসারে থাকিতে হইলে বিপদ ঘটিবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা, বিপদে পতিত হইলে একবারে অভিভূত হইয়া পড়া মূঢ়তার লক্ষণ, স্থিরচিত্ত হইয়া তাহার যথা-সাধ্য প্রতীকারের চেষ্টা করা সকলেরই উচিত। দেশের হিতসাধনে, স্বীয় কর্ত্তব্য-পালনে, ধর্ম্মযুদ্ধে যিনি প্রাণপণে চেষ্টা করেন—মৃতইবা হন, তিনি উচ্চশ্রেণীর বীর। যে রমণী এইরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিতে পারেন, তাঁহাকে আমরা প্রকৃত "বীরাঙ্গনা" বলিয়া অভিহিত করি।

ইংরাজ ও বাঙ্গালী।

তিন কিম্বা চারি শত বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজের খবর বঙ্গদেশে কে রাখিত? ইংরাজ বহুদূরে সাগরপারে তরঙ্গমালা-পরিবেষ্টিত শ্বেতদ্বীপে বাস করিতেন। কিন্তু ইংরাজ যখন আমাদিগের রাজা হইলেন, আমাদিগের সঙ্গে ইংরাজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সংস্থাপিত হইল, আমরা ইংরাজের বাক্যে চলিতে লাগিলাম, ইংরাজের অনুকরণ করিতে লাগিলাম, ইংরাজের অধিকৃত দেশে বাস করিতে লাগিলাম, তখন ইংরাজ ও বাঙ্গালীর বিষয়ে তুলনায় সমালোচনা: আবশ্যক হইল। প্রথমতঃ ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে দেশগত বিভিন্নতা। এই দেশগত বিভিন্নতায় ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মধ্যে শারীরিক ও মানসিক উভয়বিধ প্রভেদ আছে। ইংরাজ স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ, বিশেষ-রূপে কর্ম্মঠ, সাহসী, অধ্যবসায়শালী, চতুর ও কার্য্যতৎপর। বাঙ্গালী উষ্ণপ্রধান দেশবাসী বলিয়া স্বভাবতঃ দুর্ব্বল ও ভীরু এবং উদ্যমশীল ও পরিশ্রমী হইলেও সহজেই অবসন্ন হইয়া পড়েন। বাঙ্গালী বুদ্ধিমান্ কিন্তু দীর্ঘসূত্রী।

ইংরাজ ও বাঙ্গালীর শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। ইংরাজ বাল্যকাল হইতে আপনার গন্তব্য পথ মনোনীত করিয়া লইতে সক্ষম। বাঙ্গালী যাহা হউক একটা অবলম্বন করিয়া পরে তাহা পরিত্যাগ করিতে পশ্চাৎপদ নহেন। যে ইংরাজ ভাষাজ্ঞ পণ্ডিত হইবেন এইরূপ স্থির সঙ্কল্প করেন, তিনি অল্প বয়সেই অনেক প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারের জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে প্রচুর জ্ঞান সঞ্চয় করেন, কিন্তু বাঙ্গালীর সে অধ্যবসায় নাই, সেইরূপ বয়সে সেইরূপ জ্ঞান সঞ্চয় করা তাঁহার পক্ষে দুঃসাধ্য বলিয়া বোধ হয়। দারিদ্র্য বা অন্য বিঘ্ন বিপত্তিতে ইংরাজকে পরাঙ্মুখ করিতে অপারগ, কিন্তু সামান্য বিপৎপাতে বাঙ্গালীকে নিরস্ত করিয়া ফেলে। যে ইংরাজ নৌ-ব্যবসায়ে পারদর্শিতা ও গৌরবলাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বাল্যকাল হইতেই সেই ব্যবসায়ে দীক্ষিত হয়েন। ইহাতে ধনী ও নির্ধনের বিচার নাই। একজন রাজার পুত্র বা পৌত্র অনায়াসেই তাহাতে প্রবেশ করিবেন। কিন্তু অস্মদ্দেশে তদ্রূপ ঘটিবার নহে। এই স্থানে পদমর্য্যাদা ও জাতাভিমান প্রধান প্রতিবন্ধক। যে ইংরাজ বাণিজ্যে জীবিকা, সম্পদ্‌ ও সম্ভ্রম উপার্জ্জন করিতে মনস্থ করেন, তিনি বাল্যকাল হইতে সেই ব্রতে ব্রতী হয়েন। কিন্তু বাণিজ্যের নামে বাঙ্গালীর বিতৃষ্ণা। তিনি ব্যবসায় বুঝেন না ও ভালবাসেন না। আজ কাল দুই একজন বঙ্গবাসীর ব্যবসায়ে প্রবৃত্তি হইলেও মূলধনের অভাব, কিন্তু ইংরাজের সেরূপ অভাবে কোন ক্ষতি করিতে

পারে না। তিনি যে রূপেই হউক, সে অভাব পূর্ণ করিয়া আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়া থাকেন। ইংরাজ বাল্য-কালে সৈনিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন, কিন্তু বাঙ্গালী সে অধিকারে বঞ্চিত। কামার, কুমার, ছুতার, দরজী, জুতা-বিক্রেতা কাহারও কার্য্য ইংরাজ ঘৃণা করেন না। কার্য্যই ইংরাজের লক্ষ্মী। এই কার্য্যসেবায় তিনি সততই রত। ঐকান্তিকচিত্তে কার্য্যানুসরণই তাঁহার ধনাগম ও উন্নতির প্রশস্ত পথ। কার্য্য-বিশেষের প্রতি বাঙ্গালীর ঘৃণা প্রকাশ, তাঁহার অধঃপতনের মূল। ইংরাজ বুঝেন যে, ব্যবসা কখন মনুষ্যকে নীচ করে না, কিন্তু মনুষ্য আপন প্রকৃতি ও ব্যবস্থার দ্বারা ব্যবসাকে নীচ করিয়া ফেলেন। ইংরাজের নিকট সকল ব্যবসায়ের গৌরব আছে।

বিদ্যালয়ে পঠদ্দশার শেষ হইলে ইংরাজ দেশ পরিভ্রমণে বহির্গত হয়েন। বিবিধ দেশের আচার ব্যবহার শিক্ষা, ইংরাজের শিক্ষার একটী অঙ্গ। ইহা বাকি থাকিতে, ইংরাজ শিক্ষাকে অঙ্গহীন বোধ করেন। বাঙ্গালী গৃহ হইতে বিদেশ ভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হইতে অনিচ্ছু। ইংরাজের ছাত্রজীবন মানসিক ও শারীরিক উভয় প্রকার উন্নতির কাল। সেই কাল তাঁহার পক্ষে আনন্দ ও সুখময়। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তিনি শারীরিক উন্নতিও সাধন করিয়া থাকেন। বিদ্যালয়ে নাট্যাভিনয়, ব্যায়াম প্রভৃতি অনেক আমোদ হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর এ সব বিষয়ের তাদৃশ চর্চ্চা নাই। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় বলিয়া, ইংরাজ বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত কার্য্য-কুশল থাকেন, কিন্তু বাঙ্গালী ইহার অভাবে যৌবনে বৃদ্ধ হইয়া পড়েন। ইংরাজ শিক্ষাকে কার্য্যে পরিণত করেন, কিন্তু বাঙ্গালীর শিক্ষা প্রায় পুঁথিগতই থাকিয়া যায়। ইংরাজ জীবনের শেষ পর্য্যন্ত পুস্তক পাঠ করেন, কিন্তু সংসার-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিতে না করিতে পুস্তকের সহিত বাঙ্গালীর সম্বন্ধ রহিত হইয়া যায়। ইংরাজ যাহা জানেন না, তাহা অপরের নিকট জানিয়া লইতে লজ্জা বোধ করেন না; কিন্তু বাঙ্গালী অযথা লজ্জাপ্রযুক্ত অনেক সময়ে শিখিবার সুযোগ হারান ও ক্ষতিগ্রস্ত হন। ইংরাজের শিক্ষাভিলাষ প্রবল, যে কোন প্রকারে হউক, শিখিতেই হইবে; বাঙ্গালীর অভিমান ও আলস্য তাঁহার সর্ব্বনাশের হেতু।

ইংরাজ কর্ত্তব্যপরায়ণ। তিনি সময়ের মূল্য বুঝেন। কর্ত্তব্যানুরোধে সময়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য তিনি আপন জীবন পর্য্যন্ত সমর্পণ করিয়া থাকেন। সময়ের মূল্য বুঝেন বলিয়া ইংরাজের এত উন্নতি। বাঙ্গালী তাহা বুঝেন না বলিয়া তাঁহার এত দুর্গতি।

ইংরাজ রাজার জাতি বলিয়া কথঞ্চিৎ তেজীয়ান্ হইবার কথা, কিন্তু তাহা না হইলেও তিনি স্বভাবতঃ বলিষ্ঠ, প্রফুল্ল-

চিত্ত ও তেজীয়ান্। ইংরাজের চলন তেজীয়ান্, বাক্য বলীয়ান্ ও কার্য্য ফলবান্। তাঁহার অধিকাংশ কার্য্য তেজঃসম্ভূত ও ফলপ্রদ। বাঙ্গালীর দৈহিক দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত চলন নিস্তেজ, ভাষা দুর্ব্বল, ও অনেক সময়ে কার্য্য নিষ্ফল। ইংরাজ মিথ্যা কথা কহিতে পারেন, বাঙ্গালীও মিথ্যা কথা কহিতে পারেন। কিন্তু ইংরাজ ও বাঙ্গালীর মিথ্যা কথার প্রভেদ এই যে, ইংরাজ যদি মিথ্যা কথা কহেন, তাহাও তেজের সহিত; বাঙ্গালীর মিথ্যা কথা ভয়সংযুক্ত, সুতরাং দূষণীয় মিথ্যা বলিয়া পরিগণিত হয়।

আপনার লোক জন সম্মুখে উপস্থিত না থাকিলে একজন সম্ভ্রান্ত ও ধনী ইংরাজ একটী ভৃত্যের কোন কার্য্য করিতেও সঙ্কুচিত ও অসম্মত নহেন। কিন্তু বাঙ্গালী, চাকরের জন্য সেই কার্য্য ফেলিয়া রাখিবেন। চাকর যতক্ষণ না আসিবে, সেই কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। বাঙ্গালী যতক্ষণ ডাকিয়া চেঁচান দিয়া পট্‌কায় বা আলবোলায় তাম্রকূট সেবন করিবেন, ইংরাজ ততক্ষণ স্বহস্তে কার্য্য উদ্ধার করিয়া লইবেন।

ইংরাজের মস্তিষ্ক নবোদ্ভাবন ও নবা-বিকার-শক্তিতে বলীয়ান্। বাঙ্গালী উদ্ভাবনকার্য্যে তত্টা পটু নহে; সুতরাং নূতন যন্ত্রের বা কলের সৃষ্টি তাঁহার পক্ষে অসাধারণ। ইংরাজ বিজ্ঞানে পণ্ডিত, তাই আজ বিজ্ঞানবলে পৃথিবীর অধীশ্বর। ইংরাজ গ্রন্থপ্রণয়নে বা বিরচনে মতিমান্, কিন্তু প্রতিভাশালী বাঙ্গালী তাহাতে ন্যূন নহেন। ইংরাজ গুণগ্রাহী। বাঙ্গালীর নিকট পরের গুণ চক্ষুশূল। পরের গুণ উল্লেখ করিতে হইলে বাঙ্গালীর মাথায় বজ্রাঘাত হয়।

ইংরাজ মহিলা বুদ্ধিমতী ও বিদ্যাবতী। নারীশিক্ষা ইংরাজ সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ। ইঁহারা যে কেবল মাত্র পুস্তক পাঠে জ্ঞান অর্জ্জন করেন, তাহা নহে; বিবিধ প্রকার সাংসারিক কার্য্যেও ইঁহাদিগের শিক্ষা অত্যাবশ্যক। ইঁহারা স্বাধীনভাবে সমাজে গতিবিধি করেন বলিয়া অনায়াসেই সমাজের রীতি নীতি শিক্ষা করিতে সক্ষম। কাহাকে কিরূপ সম্ভাষণ করিতে হইবে, কাহার নিকট কিরূপ ভাবে দাঁড়াইতে হইবে, কাহার সহিত কিরূপে কর-মর্দ্দন করিতে হইবে, এই সমস্ত তাঁহারা আপনা আপনি শিখিয়া লয়েন। বঙ্গীয় মহিলা বুদ্ধি-জীবিনী, কিন্তু কতদূর বিদ্যাবতী বলা যায়? অস্মদ্দেশে নারীশিক্ষা একপ্রকার বিড়ম্বনা মাত্র। দুই এক স্থানে দুই চারিটী রমণী শিক্ষিতা নামের যোগ্যা। যত দিন না সমগ্র বঙ্গদেশ স্ত্রীশিক্ষাকে একটী প্রয়োজনীয় কর্ত্তব্য জ্ঞান করিবেন, তত দিন নারীশিক্ষা আমাদিগের দেশে ফলপ্রদ হইবে না। শিখিতে হয় বলিয়া দুই একখানি বই পড়িয়া ছাড়িয়া দিলাম, এরূপ করিলে শিক্ষা হয় না। বঙ্গীয় কামিনী স্বাধীনভাবে সমাজে মিশিতে পান না। সমাজের নিয়মাবলী শিক্ষা

করিবার তাঁহার তত সুবিধা ঘটে না। অনেক ইংরাজ রমণী উত্তম বা দক্ষ গৃহিণী বটে, স্বহস্তে গৃহের সমস্ত আয় ব্যয়ের হিসাব রাখিয়া থাকেন, এবং গৃহস্থলীর সুব্যবস্থার বন্দোবস্ত করিয়া দেন, কিন্তু শিশুর লালন পালন আদি অনেক কার্য্যের ভার অপরের হস্তে ন্যস্ত হয়। ইংরাজ স্ত্রী পুরুষের মধ্যে সাম্যভাব আছে। স্ত্রী একপ্রকার পুরুষের সহিত সমান হইয়া গৃহকার্য্য পরিচালন এবং সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। অনেক সময় তাঁহার মত বলবৎ হয়। আমাদিগের দেশে স্ত্রীলোকে প্রায় গৃহের সমস্ত কার্য্যই করিয়া থাকেন। শিশুপালন, রন্ধন, গৃহপরিমার্জন, ইত্যাদি সকলগুলিই তাঁহার করণীয়। অধুনাতন দুই একটী স্ত্রীলোক অবস্থাবিশেষে সেই সকল পরিত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অস্মদ্দেশে স্ত্রী স্বামীর বশবর্ত্তিনী। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ইতর বিশেষ আছে। স্বামী, স্ত্রীর উপাস্য দেবতা—স্ত্রী, তাঁহাকে পূজা করেন।

সাধারণতঃ ইংরাজ রমণী স্বামীর সহিত গির্জ্জায় গিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিয়া থাকেন। বঙ্গীয় কামিনী গৃহে থাকিয়া ষষ্ঠী মাকাল পূজা আদি করিয়া থাকেন। সাধারণতঃ ইংরাজ কামিনীঃ অপেক্ষা বঙ্গীয় রমণী অধিকতর নিষ্ঠাবতী ও ধর্ম্মপ্রাণা। ধর্ম্মই তাঁহার প্রাণের প্রাণ। তিনি খাইতে, শুইতে, উঠিতে, বসিতে ধর্ম্মকার্য্যের অনুসরণ করিয়া থাকেন। তিনি ধর্ম্মান্ধ এবং তাঁহার জীবন ধর্ম্মময় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইংরাজের ধর্ম্ম, নিয়ম ও পদ্ধতির অধীন, কিন্তু বাঙ্গালীর ধর্ম্ম সর্ব্বকালে ও সর্ব্বস্থানে।

দ্বারস্থ ভিক্ষুককে প্রত্যহ মুষ্টিমেয় তণ্ডুল ভিক্ষা দান করা বঙ্গীয় কামিনীর গৃহকার্য্যের একটা অঙ্গ। আপনার প্রস্তুত অন্নব্যঞ্জন হইতেও তিনি ক্ষুধার্ত্ত ভিক্ষুককে খাওয়াইয়া সন্তোষ লাভ করেন। ভিক্ষুক বাটী হইতে নিষ্ফল চলিয়া যাইলে, তিনি মহাপাপ মনে করেন। ইংরাজ কামিনীর সেরূপ শিক্ষা ও সংস্কার কিছু আছে বলিয়া বোধ হয় না। সাধারণ ভিক্ষুকের প্রার্থনায় তাঁহার কর্ণপাত হয় না, না হইবার কারণও আছে।

সন্তানকে শিক্ষাদান ইংরাজ মহিলার একটী মহৎ গুণ। বঙ্গীয় কামিনী সে বিষয়ে অজ্ঞ। বাল্যকালে মাতা সন্তানকে যে শিক্ষাদান করেন, তাহা হৃদয়গ্রাহী ও ফলপ্রদ; সেই জন্য যৌবনে সহজেই ইংরাজের স্বভাব সংগঠিত হইয়া যায়, এবং ইংরাজ কার্য্যকুশল হইয়া উঠেন। ইংরাজমহিলাগণ নানাবিধ ভোগ-বিলাসিতার অনুসরণ করেন। তাঁহারা সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছদ ধারণ, সুগন্ধ দ্রব্য ব্যবহার, নাট্যাভিনয় দর্শনাদি সুখ সম্ভোগ করেন। পুরুষের ন্যায়ও আবার অনেকে বহুবিধ ব্যবসায়াবলম্বিনী হয়েন। কেহ ডাক্তারী, কেহ ব্যারিষ্টরী, কেহ মাষ্টারী ইত্যাদি ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ

করেন। অস্মদ্দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতা-স্রোত প্রবেশ করিয়াছে। এইক্ষণে দুই এক জন বঙ্গীয় কামিনী উপরি-উক্ত ইংরাজ রমণীগণের অনুকরণ আরম্ভ করিয়াছেন। অনেক ভদ্র ইংরাজমহিলা বাজারে গিয়া বাজার করিয়া থাকেন, বঙ্গদেশে তাহা আজও চলিত হয় নাই।

ইংরাজ ও বাঙ্গালীর খাদ্যে ও পরিচ্ছদে প্রভেদ আছে। ইংরাজ মাংসাশী ও স্থূলবস্ত্রধারী, বাঙ্গালী শাকান্নভোজী সূক্ষ্ম-বস্ত্রপরিধায়ী। খাদ্যের ও পরিচ্ছদের প্রভেদে ইংরাজ ও বাঙ্গালীর দৈহিক ও মানসিক প্রভেদ ঘটে। ইংরাজ স্বাধীনতা-প্রিয়। স্বাধীনতা তাঁহার শরীরের অস্থি ও মজ্জা এবং জীবনের প্রধানতম সুখ। বাঙ্গালীর স্বাধীনতা নাই, কি করিবেন, পরাধীনতা স্বীকার করিতে হইয়াছে। ইংরাজের দেশহিতৈষিতা আছে। তিনি জাতীয় উন্নতির পক্ষপাতী। দেশের মঙ্গলের জন্য তিনি প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত। বাঙ্গালীর দেশহিতৈষিতায় অনেক সময় সরলতার অভাব দৃষ্ট হয়। ইংরাজের ঐক্য আছে। ইংরাজ যে কাজ করেন, তাহা দশজনে মিলিয়া করেন। তাঁহার রাজ্যশাসনপ্রণালীও দশ জনের পরামর্শসম্ভূত। তাঁহার রাজ্য দশ জনের রাজ্য। বাঙ্গালীর ঐক্য কথার কথা। বাঙ্গালী সে বিষয়ে চির-কাল বঞ্চিত। বাঙ্গালীর জাতীয় সহানুভূতি কম। তিনি পরদ্বেষী ও পর-শ্রীকাতর। তিনি পর, এমন কি, আত্মীয় স্বজনেরও ছিদ্র অন্বেষণে তৎপর। এই গুণেতে তিনি আবার আপনার বিদ্যাবত্তার ও বুদ্ধিমত্তার গৌরব করিয়া থাকেন।

ইংরাজের বিবাহকার্য্য দিনমানে গির্জ্জায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। বাঙ্গালীর বিবাহকার্য্য রাত্রিকালে কন্যাগৃহে হইয়া থাকে। ইংরাজের পরিণয় সামাজিক চুক্তি (civil contract) বলিলেও হয়, বাঙ্গালীর বিবাহ একটী ধর্ম্মমূলক বিধি (Religious Institution)। ইংরাজের বিবাহসূত্র ছিন্ন হইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালীর পরিণয়শৃঙ্খল, ইহ জগতের কথা দূরে থাকুক, পর জগতেও বিচ্ছিন্ন বা ভগ্ন হয় না। বাঙ্গালীর বিবাহ অল্প বয়সে হয়, কিন্তু ইংরাজের বিবাহ পরিণত বয়স না হইলে ঘটে না। ইংরাজ একান্নভুক্ত পরিবারপ্রণালী ভালবাসেন না। বাঙ্গালী একান্নভুক্ত পরিবার প্রথা-প্রিয়। তিনি পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী আদি দশজন আত্মীয় স্বজনের সহিত বাস করিয়া সন্তোষ লাভ করেন।

বিপৎকালে অতি সামান্য উপকার প্রাপ্ত হইলেও ইংরাজ তাহা বিস্মৃত হন না। তিনি সুযোগ পাইলেই, উপকারীর উপকার করিয়া থাকেন। বাঙ্গালী অনেক সময়ে অকৃতজ্ঞ। তিনি উপকারীর উপকার পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়া কখন কখন তাঁহার অনিষ্ট সাধনের ত্রুটি করেন না।

ইংরাজ নিয়ম ও সুশৃঙ্খলার অনুবর্ত্তী।

নিয়মই ইংরাজের উন্নতির সোপান এবং নিয়মবলেই ইংরাজ সর্ব্বত্র জয়ী। বাঙ্গালীর অধিকাংশ কার্য্য অনিয়মিত এবং বিশৃঙ্খল। এই নিয়মাভাবেই বাঙ্গালী অনেক স্থলে অকৃতকার্য্য ও নিষ্ফল।

শ্রীভূ।

নারীর বিশ্ব-হিতৈষিতা।

যেখানে নারীর পূজা হয়, সেখানে দেবতারা প্রীত হইয়া থাকেন। ইহা আমাদের শাস্ত্রের উক্তি। নারী কিরূপ সমাদরের পাত্রী, তাহা এই উক্তিতেই স্পষ্ট জানা যাইতেছে। অতি প্রাচীন কাল হইতেই নারী লোকসমাজের এইরূপ বরণীয়া ছিলেন এবং অতি প্রাচীন কাল হইতেই সমাজের পরিচালকগণ নারীর সম্মান অব্যাহত রাখিবার জন্য বিবিধ উপদেশ নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সুচ্ছায় বৃক্ষ ও সুশীতল জল যেমন পথশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত পান্থের শান্তি বিধান করে, সংসারক্ষেত্রের রোগ শোক পরিতাপের মধ্যে নারীর কোমলতাও সেইরূপ লোকের কাতর হৃদয় অনির্ব্বচনীয় শান্তিরসে স্নিগ্ধ করিয়া থাকে। নারীর এই অসামান্য কোমলতার নিদর্শন সকল দেশেই পাওয়া যায়। যে দেশে স্ত্রীস্বাধীনতার নিয়ম প্রতিষ্ঠিত, পুরুষের ন্যায় নারীগণও যে দেশে অসঙ্কুচিতভাবে সকল স্থানে গমনাগমন করেন এবং সকলের সহিত আলাপ পরিচয়ে ব্যাপৃত থাকেন, সেই দেশের নারীজাতির কোমলতার ও করুণার একটী বিশ্বব্যাপী মহানুভাব দেখিতে পাওয়া যায়। যেখানে লোকে নানা প্রকার জ্বালা যন্ত্রণায় নিপীড়িত হয়, সেইখানে এই কোমলহৃদয়া করুণাময়ী কুলমহিলারা নিপীড়িতদিগের শুশ্রূষার জন্য অগ্রসর হয়েন। ইউরোপের মহাসমরসমূহের বিবরণে আমরা নারীর এই সার্ব্বজনিক সদয় ভাবের পরিচয় পাই। ক্রিমিয়ার যুদ্ধের সময়ে একটী বিশ্বহিতৈষিণী নারী আহত সৈনিকদিগের শুশ্রূষায় কিরূপ যত্ন প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসপাঠকের অবিদিত নাই।

এখন ভারতের স্থানে স্থানে মহামারীর আবির্ভাব হইতেছে;—বোম্বাই, পুনা, করাচী, পঞ্জাব প্রভৃতি স্থানে এই মহামারীতে বহুসংখ্যক লোকের মৃত্যু হইতেছে। রোগাতুরদিগের শুশ্রূষার জন্য ইংলণ্ডের মহিলারা দলে দলে ভারতবর্ষে উপস্থিত হইতেছেন। ইহাঁরা সংক্রামক ব্যাধির বিভীষিকায় দৃক্‌পাত করেন নাই, বিদেশের জলবায়ুর বিষয় ভাবিয়া দেখেন নাই, পথের দূরত্বে বিচলিত হয়েন নাই এবং বিশাল সাগর অতিক্রমপূর্ব্বক অপরিজ্ঞাত স্থানে

অপরিচিতদিগের মধ্যেও অবস্থিতি করিতেও সঙ্কুচিত হইয়া উঠেন নাই। ইঁহারা যাহাদের ভাষা বুঝিতে পারেন না, যাহাদের আচার ব্যবহার জানেন না, তাহাদের শুশ্রূষার জন্য স্বদেশ ও আত্মীয় স্বজন ছাড়িয়া বহু দূরদেশে সমাগত হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা মহত্তর কার্য্য, ইহা অপেক্ষা লোক-হিতৈষিতার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত, ইহা অপেক্ষা বিশ্বজনীন স্নেহের ও দয়ার উদার ভাব আর নাই। ইহঁাদের কেহ কেহ মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণে দেহত্যাগ করিয়াছেন, তথাপি এই অপার্থিব হিতৈষিতার অপরিসীম স্নিগ্ধভাব অন্তর্হিত হয় নাই।

ইউরোপীয় সমাজের স্বাধীন কুল-মহিলারা ধর্ম্মপ্রবৃত্তিতে পরিচালিত হইলে, এইরূপে সর্ব্বজনীন মঙ্গল হয়। আমাদের সমাজে স্ত্রী-স্বাধীনতা নাই, ভবিষ্য-দর্শী শাস্ত্রকারগণ সমাজের মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া নারীগণকে অপরের অধীন করিয়াছেন। কেহ কেহ বলিতে পারেন অধীনতায় তাঁহাদের হিতৈষিতার গতি সঙ্কুচিত হইয়াছে। অন্তঃপুর যাঁহাদের বিচরণস্থান, পরিচিত আত্মীয় স্বজন মাত্র যাঁহাদের দর্শনীয় বিষয়, সর্ব্বদা স্বতন্ত্রতা হইতে নিবৃত্ত থাকা যাঁহাদের চিরাভ্যস্ত ও চিরন্তন ধর্ম্ম, তাঁহারা সকলের শুশ্রূষা করিতে পারেন না। কিন্তু স্থির-চিত্তে বিবেচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, এইরূপ স্বাতন্ত্র্যের অভাবে অস্মদ্দেশের নারীজাতির হিতৈষিতার গৌরব অন্তর্হিত হয় নাই। আমাদের পুরস্ত্রীগণ প্রতিবেশি-বর্গের প্রতি কিরূপ সদয় ভাব প্রকাশ করিতেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কাহারও বাড়ীতে ক্রিয়াকাণ্ড উপস্থিত হইলে ইহাঁদের মুহূর্ত্তমাত্র অবসর থাকিত না। ইহাঁরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। রন্ধনে, পরি-বেশনে, আবশ্যকমত দ্রব্যাদির সংগ্রহে ইহাঁদের কর্ম্মতৎপরতা দেখিলে হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দের সঞ্চার হইত। পূর্ব্বে প্রতিপল্লীর প্রতিগৃহেই এইরূপ অমৃতময়ী অন্নপূর্ণার আবির্ভাব দেখা যাইত। এখনও এই রমণীয় দৃশ্যের একবারে বিলোপ হয় নাই। পল্লীগ্রামের ক্রিয়াকাণ্ড উপলক্ষে এখনও এইরূপ অন্নপূর্ণার আবির্ভাব হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত শোকাতুরে সান্ত্বনা, রোগগ্রস্ত-দিগের শুশ্রূষা প্রভৃতিতে ইহাঁরা অপরি-সীম প্রীতি ও দয়ার নিদর্শন দেখাইতেন।

আমাদের দেশের পুর-মহিলাতে সর্ব্ব-জনীন প্রীতি ও দয়া আর একরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। জাতিবর্ণ-নির্ব্বি-শেষে অর্থ দান করিলে সকল জাতির লোকেই উপকৃত হইয়া থাকে। যে কোনরূপ বিপদই হউক না কেন, অর্থ সংগৃহীত না হইলে কিছুতেই উহার প্রতীকার হয় না। লোকের কর্ম্মতৎ-পরতার সহিত অর্থের সংযোগ থাকা আবশ্যক, নচেৎ সংসারের বিঘ্ন বিপত্তির নিবারণ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। এ বিষয়ে যাঁহাদের দয়া কেবল পরদেশে

নিবদ্ধ থাকে না; স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য পরদেশ ও পরজাতির কষ্ট ভাবিয়াও যাঁহারা মুক্তহস্তে অর্থদান করেন, তাঁহাদের লোক-হিতৈষিতার সীমা নাই। আমাদের দেশের মহারাণী শরৎ সুন্দরী এবং মহারাণী স্বর্ণময়ীর চরিতে এইরূপ বিশ্ব-হিতৈষিতার পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীর—

সংখ্যাবাচক পদার্থ।

(৪০৪ সংখ্যা—১৯৩ পৃষ্ঠার পর)

চারি-যুগ (সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি); বেদ (সাম, ঋক্, যজু, অথর্ব্ব); বর্ণ (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র); দিক্ (দক্ষিণ, উত্তর, পূর্ব্ব, পশ্চিম); পাদ (ধর্ম্মের ৪ পাদ সত্যযুগে—সত্য, দান, তপস্যা ও দয়া ; ত্রেতায়—সত্য, দান ও দয়া ; দ্বাপরে—দয়া ও দান ; কলিতে—দান); চতুর্ব্বর্গ (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ); আশ্রম (ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বান-প্রস্থ ও ভিক্ষু); চতুরস্র (চারিকোণা ক্ষেত্র ও বেদী); চতুর্মাস্য (পুনর্যাত্রা হইতে রাস পর্য্যন্ত চারি মাস); চতুরঙ্গ (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক); চতুঃশাল (চকমিলান বাড়ী); চতুরম্ল (অম্লবেতস, জম্বীর, বৃক্ষাম্ল ও কাগজী লেবু); চতুর্দন্ত (ঐরাবত); চতুর্দ্দোল, চতুষ্পদী (চৌপদী ছন্দ); চতুষ্পাঠী (চতুর্ব্বেদ পাঠস্থান); চতুর্ব্বেদী (চতুর্ব্বেদজ্ঞ—চৌবে); চতুর্ব্যূহ (ভগবানের চারি প্রকার মূর্ত্তি); চতুষ্পথ (চৌমাথা পথ অথবা চতুরাশ্রম-পালনকারী ব্রাহ্মণ); চতুরানন (ব্রহ্মা), চতুর্মুখ (ব্রহ্মা এবং এক প্রকার ঔষধ)। রাজনীতি (সাম, ভেদ, দান ও সন্ধি)।

পাঁচ—পঞ্চভূত (ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম); পঞ্চযজ্ঞ (দেবযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, ঋষিযজ্ঞ, নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞ); পঞ্চ কর্ম্ম [ন্যায়মতে (১) উৎক্ষেপণ, (২) অবক্ষেপণ, (৩) আকুঞ্চন, (৪) প্রসারণ, (৫) গমন। বৈদ্যক মতে—বমন, রেচন, নস্য, নিরূহ, ও অনুবাসন]; পঞ্চকষায় (জম্বু, শাল্মলী, বাট্যাল, বকুল ও কুল); পঞ্চ কৃত্য (সৃষ্টি, স্থিতি, ধ্বংস, বিধান ও অনুগ্রহ); পঞ্চকোল (পঞ্চমূল পাঁচন—পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চব্য, চিত্রক ও নাগর); পঞ্চকোষ (অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়); পঞ্চ-ক্ষার (কাচ, সৈন্ধব, সামুদ্র, বীট, সৌব-র্চ্চল); পঞ্চগব্য (দধি, ক্ষীর, ঘৃত, গো-মূত্র ও গোময়); পঞ্চতত্ত্ব (পঞ্চভূত), পঞ্চমকার (মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন); পঞ্চতপা (গ্রীষ্মে চারি দিকে যজ্ঞীয় কাষ্ঠের চারিটী অগ্নিকুণ্ড করিয়া মধ্যে সূর্য্যবিম্ব রাখিয়া তপস্যা); পঞ্চ-

[illegible] শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ); পঞ্চতিক্ত (নিম্ব, অমৃত, বৃষ, পটল ও নিদিগ্ধা); পঞ্চদশী (প্রতিপদাদি পঞ্চ দশ তিথির পূরণী—পূর্ণিমা ও অমাবস্যা; অথবা ১৫ প্রকরণ সহিত শ্রীভারতী তীর্থ-বিদ্যারণ্যকৃত বেদান্তগ্রন্থ); পঞ্চনখ (শশক, শল্লক, গোধা, খড়্গী ও কূর্ম্ম); পঞ্চনদ (শতদ্রু, বিপাশা, ঐরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা এই পঞ্চ নদী সমন্বিত পঞ্জাব প্রদেশ); পঞ্চপ্রদীপ (আরতির জন্য পাঁচমুখ প্রদীপ); পঞ্চপিত্ত (বরাহ, ছাগ, মহিষ, মৎস্য ও ময়ূরের পিত্ত); পঞ্চবন্ধ, পঞ্চরত্ন (কনক, হীরক, নীলকান্ত, পদ্মরাগ ও মৌক্তিক); পঞ্চরাত্র (পঞ্চবিধ রাত্র অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয় সহিত গ্রন্থ; পঞ্চ রাত্র অর্থাৎ জ্ঞান যথা—১ম ও ২য় সাত্ত্বিক জ্ঞান; ৩য় নৈর্গুণ্য জ্ঞান; ৪র্থ রাজসিক জ্ঞান; ৫ম: তামস জ্ঞান); পঞ্চ লক্ষণ (সর্গ, প্রতিসর্গ, বংশ, মন্ব-ন্তর ও বংশানুচরিত, পুরাণের এই পাঁচ লক্ষণ); পঞ্চবটী (অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, ধাত্রী ও অশোক); পঞ্চ বল্কল (ন্যগ্রোধ, ডুম্বর, প্লক্ষ, অশ্বত্থ ও বেতস); পঞ্চবাণ (দ্রবণ, তাপন, শোষণ, মোহন ও উন্মাদন); পঞ্চ শস্য (ধান্য, মুগ, তিল, যব ও সর্ষপ); পঞ্চসূনা (চুল্লী, পেষণী, উপস্কর, কণ্ডনী ও উদকুম্ভ); পঞ্চাগ্নি (উদরে গার্হ-পত্য, মধ্যদেশে দক্ষিণ, আস্যে আহবন, [illegible] মস্তকে সভ্য ও পর্জ্জা); পঞ্চস্বরোদয় (পঞ্চ স্বরের উদয় অর্থাৎ প্রকাশ সহিত জ্যোতিঃশাস্ত্র; পঞ্চ স্বর যথা;—(১) রাজ্য; (২) মাল্য; (৩) উদাস; (৪) পীড়া; (৫) মৃত্যু; পঞ্চাঙ্গ (বাহু, জানু, মস্তক, বক্ষ, ও চক্ষু; বৃক্ষের—ত্বক্, পত্র পুষ্প, মূল ও ফল)।

পঞ্চামর (দূর্ব্বা, বিজয়া, বিল্বপত্র, অমরা লতা ও কাল তুলসী)।

পঞ্চামৃত (সশর্কর দুগ্ধ, ঘৃত, দধি ও মধু, পঞ্চম মাসে গর্ভিণীর ভক্ষ্য)।

পঞ্চোপচার (ধূপ, দীপ, গন্ধ, পুষ্প ও নৈবেদ্য।

পঞ্চ পিতা (জন্মদাতা, ভয়ত্রাতা, শ্বশুর, রাজা ও গুরু)।

পঞ্চশিখ (ধর্ম্মের হিংসা ভার্য্যা হইতে পঞ্চ পুত্র—সনৎকুমার, সনাতন, সনক, সনন্দন ও কপিল। পঞ্চাম্র (১ অশ্বত্থ, ১ পিচুমর্দ্দ, ২ চম্পক, ৫ কেশর, ৭ তাল ও ৯ নারি-কেল রোপণ করিলে আর নরক গমন করিতে হয় না)।

পঞ্চ ইন্দ্রিয় (জ্ঞানেন্দ্রিয়—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্, কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পদ, মলদ্বার ও প্রস্রাবদ্বার।

পঞ্চপাণ্ডব—যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জ্জুন, নকুল ও সহদেব।

পঞ্চকন্যা—অহল্যা, দ্রৌপদী, কুন্তী, তারা ও মন্দোদরী প্রাতঃস্মরণীয়া রমণী।

(ক্রমশঃ)।

প্রেমের গৌরাঙ্গ।

শ্রীগৌরাঙ্গের নাম বঙ্গদেশে কাহারও অপরিচিত নহে। সেই প্রেমের দেবতার কাহিনী অনেক ভক্ত অনেক প্রকারে বর্ণন করিয়াছেন, তবুও তাঁহার চরিত্র নিত্যই নূতন, তাই আমরা এই প্রেমময় শ্রীগৌরাঙ্গের গোটাকত কাহিনী পাঠিকা ভগ্নীদিগকে উপহার দিতে প্রবৃত্ত হইলাম। নবদ্বীপধামে ১৪০৭ শকে জগন্নাথ মিশ্রের ঔরসে শচী দেবীর গর্ভে শ্রীগৌরাঙ্গ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি যখন নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে সময় নবদ্বীপ গৌড়ের রাজধানী ছিল। সেই রাজধানী খানি পাণ্ডিত্যের অসীম প্রতিভায় ঝক্ মক্ করিতেছিল। নবদ্বীপের ন্যায় আর কোথাও নৈয়ায়িক পণ্ডিত এবং টোল ও চতুষ্পাঠী ছিল না। তখন পাণ্ডিত্যলাভই জীবের একমাত্র লক্ষ্য হইয়াছিল, তাই নানা দেশ হইতে পাণ্ডিত্য-লাভাশায় দলে দলে লোক সকল আসিয়া নবদ্বীপ পূর্ণ করিয়া ফেলিল। ঘাটে পথে মাঠে কেবল ন্যায় আলোচনা—আবাল বৃদ্ধ স্ত্রীপুরুষ সকলের মুখেই ন্যায়ের কথা। যখন দেশের এই অবস্থা, ঠিক সেই সময় শ্রীগৌরাঙ্গ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেবল পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় দুস্তর ভবসাগর পার হইতে পারা যায় না, সেই দুস্তর জলধি পার হইতে হইলে প্রেমের তরী আরোহণ করিয়া শ্রীনাম(হরিনাম) রূপ হাইল বাহিয়া যাইতে হয়। শ্রীগৌরাঙ্গ জীবকে তাহাই বুঝাইতে আসিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ অধ্যয়ন শেষ করিয়া অধ্যাপকতায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার অপরিসীম পাণ্ডিত্যপ্রভায় সকলে এত মুগ্ধ হইয়াছিল যে, সকল ছাত্রই সেই নবীন পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়নের জন্য লালায়িত। শ্রীগৌরাঙ্গ এই সময় একবার গয়াক্ষেত্রে গমন করিয়াছিলেন। তথায় তাঁহার জীবনের এক মহা পরিবর্ত্তন ঘটে। কেবল নয়নধারায় বক্ষ প্লাবিত হইতে লাগিল। "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" বলিয়া তিনি কেবল ধুলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই অবস্থাকে সাধারণে বায়ুব্যাধি বলিয়া চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন; ভক্তগণ "কৃষ্ণপ্রেম" বলিয়া আনন্দে গদগদ হইতে লাগিলেন, কারণ তাঁহারা বহু দিন হইতে নিমাইয়ের মত একটি কৃষ্ণভক্ত খুঁজিতেছিলেন।

শ্রীগৌরাঙ্গ গয়া হইতে প্রত্যাগমন করিয়া অধ্যাপনার্থ নিয়মিতরূপ টোলে গমন করেন সত্য, কিন্তু ছাত্রগণকে পাঠ দিতে পারেন না—অজস্র নয়নধারায় পুঁথি সিক্ত হইয়া যায়—অক্ষর নয়নগোচর হয় না। আবার বহু কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া যদি সূত্রের ব্যাখ্যা করিতে যান, তবে তাহাতে কেবল শ্রীকৃষ্ণ নামেরই ব্যাখ্যা হইয়া পড়ে। যথা,

"আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
সূত্রবৃত্তি টীকায় সকলে হরিনাম।"

শ্রীচৈতন্যভাগবত।

ছাত্রগণ সে ভাবার্থ গ্রহণ করিতে পারেন না। তাঁহারা ক্ষুণ্ণ হইয়া পণ্ডিতের অবস্থা গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট নিবেদন করিলেন। ছাত্রগণকে যথোচিত পাঠ দিবার জন্য তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে অনুরোধ করিলেন। প্রভু পূর্ব্বে গঙ্গাদাস পণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহাকে পরম শ্রদ্ধা করেন। তিনি গুরুর আদেশে পুনরায় নবোদ্যমে ছাত্রদিগকে শিক্ষাদানার্থ প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু তিনি কোথায়? তাঁহার চিত্ত শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত প্রেমার্ণবে ডুবিয়াছে, তিনি সমগ্র জগৎ কৃষ্ণময় দেখিতেছেন। সেই শ্যামসুন্দরের অপরিসীম সৌন্দর্য্যে তাঁহার হৃদয় উন্মত্ত—পাঠ দিবে কে? আবার সেই নয়নধারা আসিয়া তাঁহার নবোদ্যমে আঘাত দিল। অগত্যা তিনি শিষ্যগণকে পুস্তকে ডোর দিতে বলিয়া ও অন্য স্থলে তাঁহাদিগকে অধ্যয়নের আদেশ করিয়া অধ্যাপকতায় ক্ষান্ত হইলেন।

এই তাঁহার অপরিমেয় প্রেমের প্রথম প্রকাশ মাত্র।

২

প্রেমময়ী শ্রীরাধিকা কৃষ্ণবিরহে যেমন আকুল হইয়া রোদন করিতেন, শ্রীগৌরাঙ্গ সেইরূপ ভাবে বিভোর হইলেন। তিনি আপনাকে শ্রীমতী ও শ্রীকৃষ্ণকে স্বামী জ্ঞান করিতে লাগিলেন। যাহার মুখে কৃষ্ণনাম শুনিতেন, শ্রীমতী তাঁহার পায়ে ধরিতেন "যে কহে কৃষ্ণের নাম ধরে তার পায়।" শ্রীগৌরাঙ্গও সেই আচরণ করিতে লাগিলেন। শ্রীরাধিকা কৃষ্ণভ্রমে তমালকে আলিঙ্গন করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের জীবনও এইরূপ ভাবে পূর্ণ। তিনিও চটকপর্ব্বতকে গোবর্দ্ধন ভাবিয়া তাহা শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় পর্ব্বত বলিয়া আলিঙ্গন করিতে ছুটিতেন। শ্রীমতী কৃষ্ণবিরহে যখন অজ্ঞান, তখন।

"তুলাখানি দিল নাসিকা মাঝে,
তবে সে বুঝিনু সোয়াস আছে।"

শ্রীগৌরাঙ্গের জন্যও সে ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। এক সময় তিনি প্রেমাবেশে অচেতন হইলে সার্ব্বভৌম তাঁহার জীবন পরীক্ষার্থে—

"সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা অগ্রেতে ধরিল।
ঈষৎ চলয়ে তুলা দেখি ধৈর্য্য হইল॥"

চৈতন্যচরিতামৃত।

ফলকথা—বৈষ্ণবশাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলেই শ্রীমতীর ও শ্রীগৌরাঙ্গের জীবন সমতুল্য বলিয়া স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। তিনি আপনি উপদেষ্টা, আপনিই উপদিষ্ট। তাঁহার জীবনে একাধারে শ্রীরাধাকৃষ্ণ তত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তাই ভক্ত বৈষ্ণবেরা তাঁহাকে একাধারে রাধাকৃষ্ণ বলিয়া পূজা করেন।

প্রভু শ্রীরাধা-ভাবে বিভোর হইয়া কখন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি মান করিতেছেন, কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের আগমন প্রতীক্ষায় আকুলনেত্রে আশাপথ চাহিয়া আছেন। কখনও বা কুঞ্জ সাজাইতেছেন, আবার

কখনও বা তাঁহার মথুরা গমন স্মরণ করিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া ধরায় লুণ্ঠিত হইয়া পড়িতেছেন। গদাধর পণ্ডিত শ্রীগৌরাঙ্গের বিশেষ অন্তরঙ্গ,—বিশেষতঃ এই সময় হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও তিনি শ্রীগৌরাঙ্গের কাছছাড়া হইতেন না। অতি সতর্কতার সহিত তিনি শ্রীগৌরাঙ্গকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। একদিন কৃষ্ণবিচ্ছেদে প্রভু বড়ই ব্যাকুল হইয়া "কৃষ্ণ কোথা" বলিয়া ক্রন্দন আরম্ভ করিলেন। সে ক্রন্দন কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না দেখিয়া গদাধর বলিলেন, তিনি; তোমার হৃদয়মন্দিরেই বিরাজ করিতেছেন। ইহা শ্রবণে প্রভু স্বীয় হৃদয় বিদীর্ণ করিবার জন্য উন্মুখ হইলেন। যথা—

"হৃদয়ে আছেন হরি বচন শুনিয়া।
আপন হৃদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া॥"

চৈঃ ভাঃ।

এইরূপ ভাবে প্রভু সর্ব্বদাই বিভোর! প্রভু এখন দীন হইতে দীন, গঙ্গাস্নানার্থে যত ব্রাহ্মণ সজ্জন গমন করেন, প্রভু তাঁহাদিগের সাজি ধুতি বহিয়া লইয়া যান, আর ভক্তিভরে প্রণামপূর্ব্বক বলেন "আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার কৃষ্ণে মতি হয়।" প্রভুর সেই প্রেমার্ত্তি—সেই দীনতা দর্শনে সকলে বিস্মিতচিত্তে বিমুগ্ধপ্রাণে অশ্রু বর্ষণ করিত। দীনতা ব্যতীত মুখের চাটুকারিতায় যে ভক্তিরত্ন লাভ হয় না, প্রভুর আচরণেই তাহা বুঝা যায়।

এই সময় শ্রীচৈতন্য সঙ্কীর্ত্তনের সৃষ্টি করেন। এখনও আমরা যে কীর্ত্তন ও সঙ্কীর্ত্তনের অমৃতময় স্বাদ আস্বাদ করিতে পারি, সে প্রভুরই সৃষ্টি। প্রভু জীবশিক্ষা দিতে আসিয়াছিলেন, তাই জীবকে শিখাইলেন—প্রেমসাধন দ্বারা ভগবান্‌কে বশ করিতে হয়। এতাবৎ এই আনন্দরসে নিজেই ডুবিয়া আছেন, জীবের উদ্ধারের উপায় হইল না। তিনি নিজে সুখে ডুবিয়া থাকিতে আসেন নাই—জীব উদ্ধার করিতে— জীবকে শ্রীভগবানের অমৃতময় প্রেমাস্বাদন করাইতেই তাঁহার আগমন। সুতরাং তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। গৃহে বসিয়া থাকিলে সে কার্য্যোদ্ধার হইবে না, পাপীর দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া হরিনাম বিতরণ করিতে হইবে, তাই তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

কাটোয়ায় কেশব ভারতীর নিকট তিনি সন্ন্যাসমন্ত্র গ্রহণ করেন। যখন তিনি সন্ন্যাস গ্রহণের জন্য কেশব ভারতীর নিকট উপবিষ্ট, সে সময় কণ্টক (কাটোয়া) নগরে এক অপূর্ব্ব ভাবস্রোত বহিয়া গিয়াছিল। তাহা এই যে, কেহই প্রভুকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে দিবে না, আবালবৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলেই কাঁদিয়া আকুল। কেহ অনুরোধ করিতেছেন—প্রভো! এ নবীন বয়সে তুমি সন্ন্যাস লইও না, কেহ বা কেশব ভারতীকে অনুরোধ করিতেছেন, এ নবীন পুরুষটীকে সন্ন্যাসী সাজাইও না। এই যে শ্রীগৌরাঙ্গকে দর্শনে তাহারা আত্মহারা হইয়া নয়নজল ঢালিতেছে, এই তাহাদের উদ্ধারের সোপান। সকলে

কাঁদুক, অনুরোধ করুক, যাহা ভগবৎ-ইচ্ছা তাহা কে রোধ করিবে? প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, কোনও বাধা টিকিল না। সন্ন্যাসগ্রহণানন্তর তাঁহার নাম হইল শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। শ্রীচৈতন্য সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া নীলাচলে চলিলেন। মন্দিরে প্রবেশ মাত্র শ্রীজগন্নাথ দেব দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। যথা—

"জগন্নাথ আলিঙ্গিতে চলিল ধাইয়া।
মন্দিরে পড়িলা প্রেমে আবিষ্ট হইয়া॥"

চৈঃ চঃ।

সেই সময় নৈয়ায়িক সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য যত্নপূর্ব্বক তাঁহাকে উঠাইয়া নিজ-গৃহে লইয়া গেলেন। তিনি তাঁহার শুশ্রূষায় নিযুক্ত হইলেন। ক্রমে প্রভুর জীবনের আশা হইল। জ্ঞানী সার্ব্বভৌম বুঝিলেন ইহা মূর্চ্ছা নহে, কৃষ্ণ-প্রেমের বিকার। এই নবীন সন্ন্যাসীকে দর্শন করিয়া সার্ব্বভৌমের চিত্ত তাঁহার অজ্ঞাতে ধীরে ধীরে প্রভুর পক্ষপাতী হইয়া পড়িল। সার্ব্বভৌম মহাজ্ঞানী পণ্ডিত, কিন্তু শেষে তিনিও শ্রীগৌরাঙ্গের অনুগত হইয়া পড়িলেন, তিনিও শ্রীগৌরাঙ্গকে ভগবান্ বলিয়া স্বীকার করিলেন। প্রভুর দর্শনে জ্ঞানীর জ্ঞান—পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য ভাসিয়া গিয়াছিল, তাঁহার ভক্তিস্রোতের সম্মুখে কাহারও যুক্তি তর্ক টিকিতে পারে নাই।

নীলাচলে কিছু দিন থাকিয়া প্রভু তীর্থ-ভ্রমণে বহির্গত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে সমস্ত দেশ গ্রাম হরিনামে প্লাবিত করিতে লাগিলেন। যে একবার মাত্র তাঁহাকে দর্শন করিল, সেই কৃষ্ণনামে উন্মত্ত হইল, আবার সেই ব্যক্তি প্রভুর প্রসাদ লাভ করিয়া অন্য ব্যক্তিকে ভক্ত করিয়া তুলিল! এইরূপে সমস্ত দেশ গ্রামের লোক বৈষ্ণব হইয়া পড়িল।

(ক্রমশঃ)

শ্রীমতী নগেন্দ্র বালা—

প্রভাতী।

(৪০৫-৬ সংখ্যা—২১৯ পৃষ্ঠার পর)

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

আহারাদি শেষ করিয়া সুস্থশরীরে কুটীরের দ্বারদেশে কুসুমিত তরুতলে উপবেশন করিয়া অনিল কহিল "দেখ প্রভাতি! আমাদের মধ্যে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে! তখন আমরা বালক বালিকা ছিলাম, আর এখন যুবক যুবতী বলিয়া গণ্য হইয়াছি। আর দেখ সংসারের কত পরিবর্ত্তন—তোমার আত্মীয় যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা এখন আর নাই; সেই

রমণীয় কুটীর এখন নিতান্ত জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে, চতুর্দ্দিকে কুসুমারণ্যের শেষ নাই। কুটীরের চতুর্দ্দিক হইতে কাল কোকিলের "কুউ" "কুউ", আর মদমত্ত ভ্রমরাদলের মধুর গুঞ্জনধ্বনি শ্রুতি-কুহরে প্রবিষ্ট হইতেছে। সদ্যোজাত শিশির-জলে সুস্নাতা প্রক্ষালিতপাপা নীরবতপঃ-সমন্বিতা বসন্ত ব্রততী দলের শ্যাম সৌন্দর্য্যে চারি দিক্ আমোদিত হইতেছে।

পূর্ব্বে এ সব কি এত ছিল? কিন্তু প্রভাতি! আমি এখন প্রচুর বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছি, অর্থোপার্জ্জনেও অবশ্য সক্ষম হইব। এই তরুলতা-পরিবেষ্টিত ক্ষুদ্র পর্ণ-গৃহ হইতে তোমাকে ত্রিতল অট্টালিকায় লইয়া যাইতে পারিলেই আমার জীবন সার্থক হয়। প্রভাতী ঈষৎ হাসিতে হাসিতে মাথা নাড়িয়া কহিল—"না"।

অনিল। না কেন প্রভাতি! তুমি কি আমার উপকার উপেক্ষা কর? তুমি কি আমাকে ভালবাস না? প্রভাতী কোন কথা কহিল না, অঞ্চলে মুখ ঢাকিল।

অনিল। বল বল প্রভাতি! তুমি আমাকে ভালবাস কি না? বল বল আমার মাথা খাও, মনের কথা ভাঙ্গিয়া বল, আমার সন্দেহ ভঞ্জন কর। প্রভাতী লজ্জায় ম্রিয়মাণা অথচ হাস্যমুখে বলিল "হাঁ ভালবাসি; কিন্তু ভালবাসি বলিলে সে ভালবাসা প্রকাশ হয় না, সমস্ত পৃথিবী একত্র হইলেও আমার সে ভাল-বাসার তুল্য হইতে পারিবে না।" অনিল সেই প্রফুল্ল বন্য-লতিকার দিকে চাহিয়া চাহিয়া বাণাহত মৃগের ন্যায় অবশ শরীরে প্রভাতীর অতি নিকটে গিয়া উপবেশন করিল। প্রভাতীর কথায় আজ অনিলের সকল সন্দেহ দূর হইয়া গেল, সে নিতান্ত সানন্দচিত্তে প্রভাতীর সেই সরল সুন্দর ক্ষুদ্র মূর্ত্তিখানি প্রাণ ভরিয়া দেখিতে লাগিল।

প্রভাতী তাহার সেই ভাব দেখিয়া লজ্জায় মরমে মরিয়া গেল—কোন কথা কহিল না; কেবল হাসিতে লাগিল—সে হাসি দেখিয়া অনিলও হাসিল। হাসিয়া কহিল "প্রভাতি! বেল ফুলের মালা পরিতে ভালবাস? প্রভাতী ঔৎসুক্যের হাসি হাসিয়া কহিল "হাঁ! কই? দিবে—আছে?

অনিল। স্ব-কর-গ্রথিত এক গাছি সুরভি পুষ্পমাল্য আপন কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া প্রভাতীর গলে পরাইয়া দিল।

ঠিক্ সেই সময় একটী মধুর হুলুধ্বনি উপস্থিত হইয়া সমস্ত কাননস্থলী কম্পিত করিয়া তুলিল। চমকিত ভাবে চাহিয়া প্রভাতী দেখিল, অনিল দেখিল—অবিকশিত পলাশ বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া—মধুমতী।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

মধুমতীর অর্থে ও পরিশ্রমে প্রভাতীর সঙ্গে অনিলের বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের অগ্রে জানা গিয়াছিল যে, মধুমতীর পিতা পীতাম্বর দত্তের সঙ্গে পীতাম্বর বণিকের বিশেষরূপ জানা শুনা

ছিল। যে পীতাম্বরের নৌকা ডুবিয়া জলপথে মারা গিয়াছে, এ অনিল তাহারই বংশধর। তাহাদের আচার নিয়ম কুল-মর্য্যাদা মধুমতীর পিতার বেশ জানা ছিল। অতএব বিবাহের সময় কুলমর্য্যাদা লইয়া বিশেষ কোন গোলযোগ হইতে পারে নাই। সময় সরীসৃপের ন্যায় দ্রুতগামী, সুখের দিন তাহা হইতেও দ্রুতবেগে চলিয়া যায়। বিবাহের পর অনিল প্রভাতীর সরল প্রণয়বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া তিন বৎসরকাল পরম সুখে যাপন করিল। ইতিমধ্যে তাহাদের বিভাতী নামে একটী কন্যা ও বালসূর্য্যের ন্যায় সৌন্দর্য্যশালী সুনীল নামে একটী পুত্র জন্মিয়াছিল। মধুমতীদের জমীদারীর মধ্যে অনিলের দুই শত টাকা মাহিনায় একটী কাজ হইয়াছিল। ইদানীং তাহাদের টাকা পয়সারও কোন অভাব ছিল না। কিন্তু সেই নির্জ্জন বনভূমি তাহাদের চির অপরিত্যক্ত হইয়াছিল। তবে কিনা সেই স্থানের ঘর দ্বার অনেক উন্নত আকার ধারণ করিয়াছিল। তাহাদের অর্থ তিন ভাগে বিভক্ত হইত, এক ভাগ সুনীল ও বিভাতীর জন্য সঞ্চিত হইত, একভাগ নিজেদের সংসার খরচের জন্য ব্যয় হইত, অবশিষ্ট অংশ দ্বারা দুঃখীদিগের অভাব মোচন হইত। এই ভাবে সুখ সচ্ছন্দে তাহাদের দিন কাটিতে লাগিল। এক দিন সন্ধ্যাকালে প্রভাতী ঘরের বারান্দায় বসিয়া ছেলেটীকে এই বলিয়া সোহাগ করিতেছিল:—

কে দিল এ কুসুমের কমনীয় গাল,
কে দিল এ চাঁদ-ভাঙ্গা অধর ওষ্ঠ লাল,
কে দিল এ মেঘ-ভাঙ্গা ঘন কৃষ্ণ চুল,
কে দিল এ চাঁদ মুখ চারু চাঁপা ফুল,
কে দিল এ আলো-করা চাঁদনীর হাস,
কে দিল এ আধ আধ কোকিলের ভাষ,
কে দিল এ মন্দাকিনী নয়নের কোণে,
কে দিল এ সরলতা বালকের প্রাণে?
চোখে জল মুখে হাসি যে আঁকিল ছবি,
সেই বিশ্ব মহাকাব্য-রচয়িতা কবি,
তাঁহার চরণে করি সভক্তি প্রণাম,
দিবানিশি করি আমি তাঁর গুণ গান।

সে সময় পাতার তল দিয়া দিয়া একটু একটু সোণার চাঁদ দেখা যাইতেছিল, মলয়-হিল্লোলে গাছের পাতা একটু একটু হেলিতে দুলিতেছিল, বিকশিত বকুল ফুল একটী একটী করিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল, অবিকশিত সেফালিকা ফুল ফুটিয়া উঠিতে-ছিল, সুগন্ধযুক্ত বসন্ত-বল্লরী প্ররোহরাশি প্রসব করিয়া নাচিতেছিল। মায়ের কোলে সুনীল ঘুমাইয়া পড়িল। প্রভাতী দোলার উপর ছেলেটীকে শোয়াইয়া মেয়েটীকে বলিল "খুকী! তুই ঝি-দিদির কাছে থাক্, মধুমতীর সঙ্গে আমার আজ সারাদিন দেখা হয় নাই; সে একবারও এ দিকে আসে নাই; আমি যে ছেলে পিলে লইয়া যাইতে অবসর পাই না তাহাতো সে কিছু বুঝে না, তাহাতে আবার ইদানী কি হইয়াছে সর্ব্বদাই কি এক রকম—বোদ্ বোদ্ পোত্ পোত্ করে গাল ফুলাইয়া থাকে, মাঝে মাঝে

চক্ষু রাঙ্গা দেখি, বোধ হয় কাঁদে, কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কয় না, কাহারও সঙ্গে ভাল করিয়া মিশে না, তাহার যে কি রোগ ধরিয়াছে, বুঝি না। আজ তাহার রোগের ভাল ঔষধ ব্যবস্থা করিতে হইবেই হইবে। অনিলের ঐ এক রকম গালফুলা রোগ ধরিয়াছে। আজ আমি চল্লাম। প্রভাতী গিয়া দেখিল, আপন শয়নকক্ষে গিয়া মধুমতী বদ্ধ-বাতায়নপার্শে উপবেশন করিয়া অন্যমনস্ক-ভাবে মৃদু মৃদু স্বরে গান করিতেছিল,

"এস হে বঁধুয়া কহ কি লাগিয়া
আসিতে বিলম হেন ?
হিমানী-ঋতুর চাঁদিমার পারা—
মু'খানি মলিন কেন ?
কি বিষাদে আজ বিষাদিত হেন
বল বল চিত্তহারী !
এখনি তাহায় ভাসাইব দূরে
বরষি প্রেমের বারি।"

প্রভাতী দেখিল মধুমতী কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া আবার কণ্ঠ কাঁপাইয়া কাঁপাইয়া গাইতে লাগিল—

"দেগো সাজাইয়া সাধের বাসর—
দেগো সাজাইয়া সই,
উজলি ভুবন, হৃদয়-রতন,
দেখ্‌লো আসিছে অই !
আঁচল ভরিয়ে আন্‌লো স্বজনি !
যতেক সুরভি ফুল,
বিনায়ে কবরী দেলো সাজাইয়া
অলকে কুসুমদুল।"

মধুমতী ক্ষণকালের মধ্যে গীত সমাপ্ত করিয়া উপাধানে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে লাগিল ও মৃদু মৃদু কহিতে লাগিল।

* * * * *

"কে সে সই ভাগ্যবতী
শ্যামেরে পেয়েছে পতি
সই কলঙ্কের ভয়—পোড়া লোক-গঞ্জনায়

* * * *

দেবের দুর্লভ মণি
যে পেয়েছে সে কি ধনী,
শ্যামের জীবনী বাড়ে সিঁথীর সিন্দুরে যায়।"

তাহাকে এই ভাবে দেখিবামাত্র প্রভাতীর সমস্ত শরীর শিহরিয়া উঠিল। আপন অজ্ঞাতসারে অপাঙ্গদেশে অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িল। প্রাণটা যেন আপনা আপনি চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে অমনি ত্রাসিত হইয়া ডাকিল, "মধুমতি, মধুমতি !" মধুমতী কি একটা জিনিশ লুকাইয়া প্রভাতীর নিকট আসিয়া বসিল। প্রভাতী তাহার মলিন মুখ, সাশ্রুনয়ন যখনি দেখিল, তখনি কাঁদিয়া ফেলিল, কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল "মধুমতি ! সখি ! হৃদয়ের বন্ধু ! তোমার কি হইয়াছে ? আমার নিকট খুলিয়া বল, আমাকে আর কষ্ট দিও না। আমি জানি তোমার এমন কোন কথা নাই যে, আমার নিকট প্রকাশ করিতে না পার ; বল বল, মনের কথা খুলিয়া বল, আমার প্রাণ দিয়াও যদি তোমার কষ্টের লাঘব করিতে পারি তাহা করিব।" মধুমতী কোন উত্তর দিল "না"—প্রভাতীর কোলে মাথা রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল। মধুমতীর

একরাশ চুল প্রভাতীর কোলের উপর এলো থেলো হইয়া লুটিতেছিল। প্রভাতী মধুমতীর চুল সরাইতে সরাইতে মুখ মুছাইতে মুছাইতে কহিল, "বল্ তোর্ এ দুঃখ কিসের?" মধুমতী কথা কহিল না, প্রভাতীর সরল সুন্দর মুখখানির দিকে যতই চাহিতে লাগিল, ততই তাহার দুঃখ বাড়িতে লাগিল। প্রভাতী কহিল "আমি তো ভাবিয়াই পাই না, তুমি আমার নিকট কি গোপন কর। এইবার বল দেখি মধুমতি! সুখের সমুদ্রের ঢেউ তুমি, তোমার এ দুঃখ কিসের?" তবুও মধুমতী কথা কহিল না। প্রভাতী কহিল, "বল বল, আর নীরব হইয়া রহিও না।" মধুমতী প্রভাতীর কোলে মুখ লুকাইয়া মৃদুকম্পিতস্বরে কহিল "আজ থাক, কাল কহিব।"

(ক্রমশঃ)।

নারীসুহৃদ্।

(১)

বর্ত্তমান শতাব্দী শেষ হইয়া আসিল। আর একটী বৎসর মাত্র বাকী আছে। এ বৎসরও দেখিতে দেখিতে চলিয়া যাইবে। সুতরাং আমরা বর্ত্তমান শতাব্দীর মহাপুরুষগণের চরিত্র আলোচনা করিয়া দেখিব, তাঁহাদের দ্বারা নারীসমাজের কি কি কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। ভারতীয় মহিলাকুলের সুহৃদ্‌রূপে যে সকল মহাপুরুষ বিগত শত বর্ষের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান পুরুষ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। ভারতীয় নারীসমাজ রামমোহনের নিকট যে শতবিধ উপকার ঋণজালে চিরবদ্ধ, তন্মধ্যে প্রধানতম অনুষ্ঠান ঐ মহাত্মার সতীদাহ নিবারণ চেষ্টা। শিক্ষার বহুবিস্তৃতি ও সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে সতীদাহরূপ ভীষণ ব্যাপার কল্পনার অন্তরালে লুকায়িত। পিতামহী দেবীর উপকথায় পরিণত হইলেও এই ভয়ঙ্কর কুপ্রথা ৬৫ বৎসর পূর্ব্বেও বিদ্যমান ছিল। সতীদাহ যাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন, এমন লোক এখনও জীবিত আছেন। জীবিত অশীতিপর বৃদ্ধদের মুখে শুনা যায় যে, সাধারণতঃ স্বেচ্ছায় সহমরণ হইতে হইতে শেষে এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল যে, স্বামীর মৃত্যুতে বিধবার সহমরণ এক প্রকার অপরিহার্য্য হইয়া পড়িল। মৃত পতির জ্বলন্ত চিতা আরোহণ করিতে না পারা দুরপনেয় কলঙ্কের কথা হইয়া দাঁড়াইল। ক্রমে বলপূর্ব্বক বিধবার দেহযন্ত্রের অবসান করাও ধর্ম্মকর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত হইল। এইরূপ সহমরণ-প্রথা যে বর্ব্বরতা—নিতান্ত নৃশংস কার্য্য, তাহা বোধ হয় কেহই অস্বীকার করিবেন না। কিন্তু বাস্তবিকই সহমরণ-

প্রথার চরম ফল এইরূপ দাঁড়াইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যখন কিশোরবয়স্ক বালক, তখন তিনি স্বয়ং স্বচক্ষে এইরূপ একটী লোমহর্ষণ ঘটনা দর্শন করিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। এইরূপ নিষ্ঠুর কার্য্যের অনুষ্ঠান তাঁহার হৃদয় এতই বিচলিত করিয়াছিল যে, তিনি সেই মুহূর্ত্তে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, জীবন পণ করিয়া এ কুপ্রথার উচ্ছেদসাধনের চেষ্টা করিবেন।

বিধাতা কোন্ সূত্রে কাহার দ্বারা কি কার্য্যের সূত্রপাত করেন, তাহা মানব-বুদ্ধির অতীত। স্পর্শমণির স্পর্শলাভে লৌহ স্বর্ণ হয়। মানুষ তাহা দেখিয়া বস্তুর গুণ-বৈচিত্র্য স্মরণ করিয়া অবাক্ হয়। কিন্তু দুর্ব্বল ক্ষুদ্র মানবশিশু বিধাতার স্পর্শলাভে কি আশ্চর্য্য দেব-শক্তি লাভ করে, তাহা মানুষ একটীবার তলাইয়া ভাবে না! বিপুল সমাজশক্তি শাস্ত্রবাক্যের কদর্থ ও স্বার্থান্ধব্যাখ্যার বলে প্রবল প্রতাপ বিস্তার করিয়া রাজত্ব করিতেছে, যাহার ভয়ে মহাবল ও পরাক্রমশালী ইংরাজ-রাজও সতীদাহ নিবারণের চেষ্টায় সম্পূর্ণ পক্ষপাতী হইয়াও তন্নিবারণে সাহসী হইতেছেন না, এমন সময়—এমন দুর্দ্দিনে পুণ্যাত্মা পুরুষপ্রবর রামমোহন ইহার বিরুদ্ধে সমর ঘোষণা করিলেন। তাঁহার অসামান্য শাস্ত্রজ্ঞান ও প্রবল যুক্তিবলে সার্ রাজা রাধাকান্ত দেব-প্রমুখ প্রবল-পক্ষ ক্রমে হতবল ও অস্ত্রহীন হইয়া পড়িলেন। ভারত-ললনার পরম সুহৃৎ প্রাতঃস্মরণীয় লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক মহাশয় রামমোহন রায়ের দর্শনপ্রার্থী হইয়া লোক প্রেরণ করিলেন। গবর্ণর জেনারেলের আগ্রহাতিশয়ে বাধ্য হইয়া রাজা কলিকাতার রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হন। সেই পরিচয় ও সাক্ষাতের ফলে জীবন্ত নারীদেহ অলন্ত চিতানলে নিক্ষিপ্ত হওয়া নিবারিত হইল। সতীদাহের পক্ষীয় লোকেরা তাহাদের অনুষ্ঠিত পুণ্য কার্য্যের প্রতিরোধের বিরুদ্ধে বিলাতে আপিলও করিয়াছিলেন! নারীসুহৃৎ রামমোহনের বিশাল হৃদয়ে দুর্ভাবনার যে তরঙ্গ উঠিয়াছিল, তাহারই তাড়নায় তিনি "সাত সমুদ্র তের নদী" পারে স্বাধীন জাতির স্বাধীন হৃদয়ে কর্ত্তব্যের জ্ঞান উজ্জ্বল করিয়া দিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। অসংখ্য লোকের নিষেধ, আত্মীয় স্বজনের ক্রন্দন ও বাধা উপেক্ষা করিয়া নারী-সুহৃৎ রামমোহন ইংলণ্ড যাত্রা করিয়াছিলেন। যে দিন তাঁহার সম্মুখে প্রিভি কাউন্সেলের বিচারে গবর্ণর জেনারেল বাহাদুরের হুকুম অক্ষুণ্ণ রহিল, সেই দিন সে বিরাট পুরুষের হৃদয়কন্দর হইতে আনন্দের মন্দাকিনী-ধারা প্রবাহিত হইয়াছিল। আজ ৭৫ বৎসর পরে কে তাহার প্রবলতা অনুভব করিতে সক্ষম হইবে? আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রহৃদয় লঘুচেতা লোকের সাধ্য কি যে তাহার এক কণার কণাও সুন্দররূপে অনুভব করি?

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। গত ১৭ই জানুয়ারী ব্রাহ্মবালিকা-শিক্ষালয়ের পারিতোষিক বিতরণ হয়, তাহাতে ছোট লাট বাহাদুর সস্ত্রীক শুভাগমন করিয়া একটী অতি হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন। লেডী উডবর্ণ স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করিয়াছেন। দ্বারবঙ্গের মহারাজা ও কাশিমবাজারের মহারাজা মুনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন—৫০০ টাকা ও একটী স্বর্ণ মেডাল দানে তাঁহারা প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।

২। কুমারী ম্যানিং গত ১০ই জানুয়ারী কলিকাতায় উপস্থিত হইয়া প্রায় দুই সপ্তাহ কাল বালিকা-বিদ্যালয়াদি পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। আশা করি, তাঁহার প্রথম বারের ন্যায় এই দ্বিতীয় বারের আগমনও দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির কারণ হইবে।

৩। নানা বিঘ্ন বিপত্তির মধ্যে চতুর্দ্দশ কংগ্রেসের কার্য্য অতি সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। সভাপতি বাবু আনন্দ মোহন বসু মহাশয় যে বক্তৃতা করেন, সকল শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় লোকেই শত মুখে তাহার প্রশংসা করিতেছেন।

৪। দ্বারবঙ্গের নূতন রাজা রামেশ্বর সিংহ "মহারাজা"উপাধি পাইয়াছেন এবং ভারত ব্যবস্থাপক সভার সভ্য মনোনীত হইয়াছেন।

৫। স্বর্গীয় দ্বারবঙ্গ মহারাজের শূন্যপদে নসীপুরের রাজা রণজিৎ সিং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য হইয়াছেন।

৬। স্পেন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। দ্বীপবাসীরা বিদ্রোহী। মার্কিণ-সেনাপতি ইতিমধ্যে মেনিলা ও আরও কোন কোন নগর হস্তগত করিয়াছেন। অচিরে বিদ্রোহ দমন হইবার আশা করা যায়।

৭। বড়লাট 'আরব' নামক যে জাহাজে চড়িয়া আসেন, বড় দিনের দিন তত্রত্য বালক বালিকাদিগকে প্রচুর ভোজ দিয়া সুন্দর সুন্দর উপহার দান করিয়াছেন।

৮। প্রবেশিকা পরীক্ষার যে ছাত্র গণিতে সর্ব্বপ্রথম হইবে, কীর্ত্তিচাঁদ মেকেঞ্জি পদক নামাঙ্কিত স্বর্ণপদক তাহাকে প্রদত্ত হইবে। ইহার জন্য নসীপুরের রাজা বিশ্ববিদ্যালয়ের হস্তে ২০০০ সহস্র টাকা প্রদান করিয়াছেন।

৯। এ বৎসর বি, এল, পরীক্ষায় ১১৮ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন; তন্মধ্যে একজন মাত্র প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

১০। আগামী ১০ই মার্চ্চ লাহোরে কুক্কুর-প্রদর্শনী হইবে।

১১। তাড়াশের জমিদার রায় বনমালী রায় বাহাদুর পাবনায় শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দশ সহস্র টাকা দেন। সম্প্রতি তথায় বালকদিগের বোর্ডিং গৃহ নির্ম্মাণার্থ সাত হাজার টাকা দিয়াছেন।

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। প্রীতি ও পূজা—শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাসগুপ্তা প্রণীত। ইহাতে নানাবিষয়িণী ৮০টীর অধিক কবিতা আছে। কবিতাগুলি কবি-হৃদয়ের প্রস্ফুটিত ভাবের এক একটী সুন্দর ছবি। ইহার অনেকগুলি পাঠ করিতে করিতে আমাদের হৃদয় মুগ্ধ হইয়াছে। এই পুস্তক যিনি পাঠ করিবেন, তিনিই কবির হৃদয়ের সরলতা, পবিত্রতা, দীনের প্রতি সমবেদনা, নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যানুরাগ ও ইষ্টনিষ্ঠায় প্রীত হইবেন সন্দেহ নাই এবং তাঁহার সকল ভাবের মূলে তাঁহার ঐকান্তিক নিগূঢ় পতিপ্রেম দেখিতে পাইবেন। এরূপ পুস্তকপাঠে নারীগণ বিশেষ প্রীত ও উপকৃত হইবেন।

২। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট—শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র লাহিড়ী বি, এল প্রণীত, মূল্য ১৷৷০ টাকা। বর্ত্তমান যুগের অদ্বিতীয় বীর নেপোলিয়ান একজন অসাধারণ প্রতিভান্বিত পুরুষসিংহ। ইনি কেবল শৌর্য্যে ও বীর্য্যে অদ্বিতীয় ছিলেন না, রাজনীতি, সমাজতত্ব, দেশহিতৈষিতা, বিদ্যানুরাগ, আশ্রিতবাৎসল্য, ও মাতৃভক্তি, ভ্রাতৃপ্রেম প্রভৃতি অশেষগুণে ভূষিত হইয়া মহত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন। পণ্ডিতবর এবট্ ইহাঁর যে জীবন-চরিত লিখিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া অনেকেই ইহাঁর প্রকৃত গুণমর্য্যাদা করিতে সমর্থ হইয়াছেন। বঙ্কিমবাবু ঐ জীবনী অবলম্বনে বর্ত্তমান জীবন-চরিত লিখিয়া বঙ্গ সাহিত্যকে অলংকৃত করিয়াছেন। তাঁহার লেখা সরল ও সরস হইয়াছে এবং ইহা পাঠ করিতে আরম্ভ করিলে সমুদায় শেষ করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিতে বাসনা হয়। পাঠিকাগণ এতৎপাঠে আমোদিত, বিস্ময়াভিভূত ও উপকৃত হইবেন, সন্দেহ নাই।

৩। মানস-কুসুম—শ্রীকালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় বি, এ, সি, ই, প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা মাত্র। ইহাতে বিবিধ বিষয়ক ২৮টী কবিতা আছে। লেখক যে একজন ভাবুক, সহৃদয়, ও সুনীতির পক্ষপাতী লোক, তাহা তাঁহার কবিতাপাঠে বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়। পুস্তকখানি সুপাঠ্য। বামাবোধিনীর পাঠিকাদিগকে ইহা অর্দ্ধ মূল্যে প্রদত্ত হইবে, ইহাতে আমরা কৃতজ্ঞ হইলাম। যাঁহারা এই পুস্তক পাইতে ইচ্ছা করেন, কলিকাতা বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরীর শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের নিকট নাম ও মূল্য পাঠাইলে পাইতে পারেন।

৪। শিশুবোধ রামায়ণ—শ্রীঅক্ষয় কুমার বসু প্রণীত, মূল্য ।০ আনা মাত্র। আজি কালি শিশুদিগের উপযোগী সরল সংক্ষিপ্ত কয়েক খানি রামায়ণ প্রচারিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা অনেক উপকারের

সম্ভাবনা। এ পুস্তকখানিও সেই শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইবার যোগ্য।

৫। বনফুল হার—গীতিবাক্য—শ্রীমতী তরঙ্গিণী দাসী প্রণীত, মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র। অনেকগুলি সুভাবপূর্ণ কবিতাকুসুমে এই বনফুল-হার গ্রথিত হইয়াছে। আমরা ইহার সকলগুলি আঘ্রাণ করিয়া সমান তৃপ্তি লাভ করিলাম। লেখিকা কবিত্বশক্তি লাভ করিয়াছেন এবং অনুশীলন দ্বারা তাহার বিকাশ সাধনেও সমর্থ হইয়াছেন। কি ভাষা, কি বাক্যবিন্যাস, কি ভাব, সকলই সুন্দর হইয়াছে। অল্প মূল্যের এরূপ পুস্তক উৎসাহ প্রাপ্তির সম্পূর্ণ যোগ্য।

৬। হরিদাসী—প্রাপ্ত হইয়াছি, পশ্চাৎ সমালোচ্য।

বামারচনা।

সমুদ্র।

আহা হা! সমুদ্র তুমি মধুর কি এত!
টলমল নীল-কায়,
উছলি উছলি যায়,
নীল তরঙ্গের মালা নীল পরবত। ১
আহা হা সমুদ্র তুমি অনন্ত গভীর,
বিকাশি দশন ফেন,
মহাকাল ফণী যেন,
অনন্ত লহরী রূপে হতেছে বাহির। ২
ওহো হো সমুদ্র তুমি অনন্ত অব্যয়,
নেহারি ও নীল-কায়,
জীবাত্মা স্তম্ভিত প্রায়,
পলকে নীরধি-তুমি করিছ প্রলয়। ৩
লবণাক্ত দেহ তব মহা পারাবার,
জলেশ! তোমার জলে
নানাবিধ রত্ন মেলে,
রত্নাকর নাম তাই হয়েছে তোমার। ৪
সমুদ্র! তোমারি গর্ভে ছিল সুধা ধন,
তোমারে মন্থন করি,
সে রতন নিল হরি,
চোরের মতন আসি লোভী দেবগণ। ৫
তোমারই গর্ভেতে সিন্ধু রহে প্রভাকর,
উদয় অচল কোথা,
মিথ্যা বুঝি সে বারতা,
তুমিই প্রসব কর উষায় ভাস্কর। ৬
অযুত অযুত বর্ষি স্বর্গীয় কুসুম
তোমারি উদর হতে,
উঠে সূর্য্য শূন্যপথে,
সমীর স্বননে ভাঙ্গে প্রকৃতির ঘুম। ৭
তব নীরে সূর্য্য-অস্ত অতি মনোহর!
অংশুভরা অংশুমালী
তব অঙ্গে অংশু ঢালি,
ধীরে ধীরে নীল নীরে প্রবেশে ভাস্কর। ৮
সমুদ্র! সর্ব্বদা আর্দ্র তট-প্রান্ত তব,
দিবানিশি তব নীরে,
হাঙ্গর কুম্ভীর ফিরে,
বালুকায় শোভে কায় ওহে মহার্ণব! ১০

সমুদ্র! জীমূত-মন্দ্রে গর্জ্জ দিবা নিশি,
সর্ব্বদা তোমার স্বর,
অতিশয় ভয়ঙ্কর,
আতঙ্কে সশঙ্ক সদা তব তটবাসী। ১১
মহার্ণব মহাপ্রাণ নর-লোকে কয়;
কখনো পরের ধন,
তুমি না কর গ্রহণ,
তিলটা ফেলিলে জলে কূলে আসি রয়। ১২
সময়ে সময়ে তুমি নানা রূপ ধর,
উষায় মধুর রূপ,
যেন প্রকৃতির ভূপ,
প্রভাতে আরেক মূর্ত্তি অতি মনোহর। ২২
সায়াহ্নে ফুলের মালী সদৃশ সাগর,
অনন্ত শরীর হয়
শুধু রশ্মি পুষ্পময়,
উর্ম্মি পরে উর্ম্মি যেন পুষ্প-অগ্নি-স্তর। ১৩
মধ্যাহ্নে নীলাম্বু তুমি ধবল-আকার,
ধবল-গিরির সম
মধুর মধুরতম,
অপরাহ্নে সোণা-মাখা দেখিতে বাহার। ১৩
কে রচিল এ বিশাল নীল পারাবার?
কেগো সে মহিমাময়,
যাহা ভাবে তাই হয়,
ধন্য সেই দয়াময়ে করি নমস্কার। ১৫

শ্রীমতী অম্বুজাসুন্দরী দাস।

পবিত্র শশু।

আমার নিকটে কেন পাঠাইলে প্রভু,
উদার পবিত্র এই অকপট শিশু।
শিশুর পালন এতো বিষম কঠিন,
কি করিব আমি ঘোর মূঢ় জ্ঞানহীন।
পাপী আমি দিবা নিশি মত্ত পাপাচারে,
সদ্ভাবে চলিতে পিতা জানি না সংসারে।
আপনাকে চালাইতে জানে না যে জন,
সে কি পারে দেবোপম শিশুর পালন?
নিতান্ত কপট দেখ অন্তর আমার,
কেমনে শিখাই সত্য সন্তানে তোমার?
অপবিত্র ভাব যার বিহরিছে মনে,
পবিত্র শিশুরে সেই শিখায় কেমনে?
পরের অনিষ্টচিন্তা সদা যার চিতে,
উদার শিশুরে সে কি পারে শিখাইতে?
কুটিলতা, দ্বেষ, ঈর্ষ্যা পূর্ণ যার প্রাণ,
কেমনে শিশুরে দিবে নীতি-ধর্ম্মজ্ঞান?
তবে কেন এ অধমে দিলে এই ভার,
আমি ত মলিন দীন অযোগ্য ইহার?
মোর কাছে দিয়ে প্রভু এ পবিত্র ধন,
ময়লা করিলে আহা! স্বরগ-রতন!

শ্রীবিনোদিনী সেন।

পারি না।

আজি মোর শূন্য মনপ্রাণ,
কেমনে গাহিব আশায় গান?
কেমনে যাইব কাছে?
লাজে ভয়ে কম্পিত হৃদয়,

পরাণ শুধুই বাসনাময়
কেমনে যাইব কাছে ?
তুচ্ছ স্বার্থে নিমগন হ'য়ে
রয়েছি কেবলি আঁধার লয়ে
কেমনে যাইব কাছে ?
সংকল্পত পারি না রাখিতে,
অন্ধকার হেরি চারি ভিতে,
কেমনে যাইব কাছে ?
তোমার বাঞ্ছিত কার্য্য যাহা,
করিতে পারি না আমি তাহা,
কেমনে যাইব কাছে ?
যা কিছু শকতি দেহে আছে,
লাগাতে পারি না তব কাজে !
কেমনে যাইব কাছে ?
দেবতা গো,
সঙ্কীর্ণ হৃদয় লয়ে কেমনে যাইব কাছে ?
কেমনে দাঁড়াব আমি এত বড় জগতের মাঝে ?
তুমি নেও হাতে ধরে ভেঙ্গে যাক্ লাজ ভয়,
তোমাতে সঁপিয়া দেই ক্ষুদ্র, তুচ্ছ এ হৃদয়।

সন্তোষ।

কেনরে পরের ছেলে ঘেরিয়া আমায় ?
এস নাক যাও সরে,
জান না ছুঁলে এ করে,
গাছের ফুটন্ত ফুল ঝ'রে পড়ে যায়।

কেন বাছা কাছে এসে
চাহিছ অমন হেসে,
কেন ও অমৃত ঢাল এ মরু হিয়ায় ?
ওই সুধা আধ বোলে
সাধ যায় নিতে কোলে,
কবেকার কথা আজি মনে পড়ে যায়।

কেনরে অধরে হেসে
চুম্বন দিলিরে এসে,
সপ্তস্বর্গ দ্বার আজি খুলে পুনরায়।

কচি মুখ মিষ্ট হাসি,
স্বর্গের অমৃত রাশি—
দেবতা-দুর্লভ ওযে মিলে তপস্যায়।

ও নয় আমার তরে,
এ মরু হৃদয় পুড়ে,
ফুটিয়া ও শিশু ফুল হাসি না ছড়ায়।
এই করি আশীর্ব্বাদ,
মা বাপের মন-সাধ
পূরাও, সুখেতে থেকে 'সন্তোষ' ধরায়।

সংসারের অসন্তোষে,
রাগ কিম্বা ক্রূর দোষে
পরশে না ও পবিত্র হৃদয় ছায়ায়।

শ্রীমতী সরোজকুমারী দেবী।

No. 408-9. January & February, 1899.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ"

৩৬ বর্ষ। ৪০৮-৯ সংখ্যা। পৌষ ও মাঘ—১৩০৫। ৬ষ্ঠ কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মাঘোৎসব—অন্যান্য বৎসরের ন্যায় ৬৯ সাংবৎসরিক মাঘোৎসব মহোৎসাহে সম্পন্ন হইয়াছে। একদিবস সকল শ্রেণীর ব্রাহ্মগণ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাটীতে সম্মিলিত উপাসনা করিয়া মহর্ষির শুভাশীর্ব্বাদ গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে ঐক্যবন্ধন দৃঢ়তর হউক।

নূতন ধর্ম্মাধ্যক্ষ—কলিকাতার নূতন লর্ড বিশপ রেবরেণ্ড ডাক্তার ওয়েল্‌ডনের অভিষেকক্রিয়া ১লা ফেব্রুয়ারি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। ইনি এক-জন উদারহৃদয় ও স্বাধীন প্রকৃতির লোক এবং ইহাঁ হইতে এ দেশের উপ-কারের আশা করা যায়।

প্লেগ—বোম্বাই সহরে পুনরায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হইয়াছে। শতকরা ৭০।৮০ জন মরিতেছে। আফ্রিকাতে ইহা নাকি চিরকাল আছে এবং এখন আরও বাড়িতেছে।

আফ্রিকায় ইংরাজ গবর্ণর—কেরো হইতে লর্ড কিচনার সুদানের গবর্ণর নিযুক্ত হইয়াছেন। তিনি সসৈন্যে দেশ পরিদর্শন করিতেছেন।

মধ্য হিন্দু কলেজ—বিবী বেজাণ্ট কাশীতে হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষার সুবিধাবিধান জন্য Central Hindu College নামে একটী কলেজ স্থাপন করিতেছেন। অনেক ধনাঢ্য হিন্দু এজন্য অনেক টাকা দান করিয়াছেন। কাশীর মহারাজা ৫০ হাজার টাকা মূল্যের অট্টালিকাসহ ভূমি দান করিয়াছেন। আনী বাসন্তীর অধ্যবসায় ও তাঁর তহিতোৎসাহকে সহস্র ধন্যবাদ।

বিধবাদিগের প্রতি সদয়তা—বিগত মান্দ্রাজ কন্‌গ্রেস উপলক্ষে মান্দ্রাজে যে

সামাজিক সভা হয়, তাহাতে নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে :—

হিন্দু বিধবার ২১ বৎসর না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাকে বিধবা-বেশে সাজান নিষ্ঠুরতা বলিয়া গণ্য হইবে। বিধবাগণ সামাজিক নির্যাতনের হাত এড়াইয়া স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনে সমর্থ হয়, তজ্জন্য এই সমিতি বরাহনগর, পুনা ও মান্দ্রাজের বিধবাশ্রমের আদর্শে বিধবাশ্রম সকল খুলিতে পরামর্শ দেন।

দাক্ষিণাত্যে ৫ বৎসরের বিধবাকেও নেড়ামাথা ও নিরাভরণ হইয়া ব্রহ্মচর্য্য করিতে হয়। রমণীগণকে সভ্য হিন্দুসমাজ মনুষ্য বলিয়া কবে মমতা করিতে শিখিবে?

বিশ্ববিদ্যালয়ের সভ্য—এ বৎসর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১০ জন নূতন সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন, তন্মধ্যে বাবু গোবিন্দ চন্দ্র দাস, এম এ, বি এল এবং বাবু হরিপদ ঘোষাল, বি, সি ই গ্রাজুয়েটদিগের দ্বারা মনোনীত।

স্ত্রী-বাগ্মী—কুমারী নোবল স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা হইয়া বিলাত হইতে আসিয়াছেন। তিনি শিক্ষা সম্বন্ধে একটী অতি সুন্দর বক্তৃতা করিয়াছেন, আরও বলিবেন।

ইংলণ্ডে শিক্ষোন্নতি—মহারাণী বিক্টোরিয়া যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন ইংলণ্ডে মূর্খ লোকের সংখ্যা ছিল শতকরা ৪০, এখন ৬।৭ জন মাত্র।

নূতন ঘড়ী—মার্কিন বৈজ্ঞানিক এডিসনের ফনোগ্রাফের অনুকরণে এক ফরাসী শিল্পকার এক ঘড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহাতে যটা বাজে, তাহার উচ্চারিত হয় এবং ঘুম ভাঙ্গিবার জন্য "ওহে জাগ" এইরূপ শব্দ উচ্চারিত হয়।

লেডি কুর্জ্জন—বর্ত্তমান বড় লাটের পত্নী মার্কিন রমণী ও বহুগুণে গুণবতী। ইনি ধনাঢ্যা ও পরিচ্ছদপ্রিয়া। শুনা যায় ২ লক্ষ টাকার পোসাক লইয়া আসিয়াছেন। ইহাঁদের দুইটীমাত্র কন্যা সন্তান। জগদীশ্বর সসন্তান ইহাঁদিগকে কুশলে রক্ষা করুন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষিকা—আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম, কুমারী চন্দ্রমুখী বসু, এম এ, এবং শ্রীমতী নির্ম্মলা সোম, এম এ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকার ইংরাজী সাহিত্যের পরীক্ষিকা মনোনীত হইয়াছেন। এদেশে স্ত্রীলোকদিগের এ প্রকার গৌরব এই প্রথম।

দেবলরাজ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

(৬)

আষাঢ় মাস। সন্ধ্যা হয় হয়। নিদারুণ গ্রীষ্মে লোকের দেহ পচিয়া যাইতেছে। কাল কাল ঘন ঘন মেঘে আকাশ ভরিয়া গিয়াছে। বাতাসের নাম গন্ধ নাই। দেখিতে দেখিতে এক পসলা

বৃষ্টি হইয়া গেল। মেঘের গাঢ়তা ও কৃষ্ণতা একটু বিরল হইল বটে, কিন্তু বৃষ্টি একেবারে ছাড়িল না, রহিয়া রহিয়া বর্ষণ হইতে লাগিল। মধ্যে মধ্যে চপলা-চমক, পরক্ষণেই কড় কড় শব্দ। চৌবেড়িয়া হইতে হাঙ্গরীবাঁকের মধ্য দিয়া শ্রীনগর অভিমুখে যে শড়ক গিয়াছে, দেবনাথ পালের গৃহ এই পথের নিতান্ত পার্শ্ববর্ত্তী। কেহ টোকা, কেহ গোল-পাতার ছাতা, কেহ বেত কাপড়ের, কেহ বা মোমজামের ছাতা মাথায় দিয়া চৌবেড়িয়ার দিক্ হইতে ঐ পথ বাহিয়া যাইতেছে। দেবনাথের জননী একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেছেন, আর মনে মনে ভাবিতেছেন, "দেবল আমার আজ না জানি কতই কষ্ট পাইতেছে! আষাঢ় মাসের মেঘ হইতে প্রায়ই বাজ পড়ে। আজ যেরূপ কড়কড় শব্দ, চৌবেড়ের দিকে হয়ত বাজ পড়িয়াছে। জানি না, আমার কপালে কি আছে। যদিও দৈবজ্ঞ ঠাকুর বলিয়াছেন, দেবলের পরমায়ু আশী বছর, ইহার মধ্যে তার কোন ফাঁড়া নাই। এই সবে বাইশ বছরে পা দিয়েছে। তবুত মেয়েমানুষের প্রাণ বোঝে না। কোন্ সকালে দুটি পান্তা ভাত মুখে দিয়ে বাছা আমার বুড়োশিবের মেলায় বেচা বেচিতে গিয়াছে, সন্ধ্যা হইল, এখনো দেখা নাই।" ;দেবল-জননী পূর্ব্ব-দ্বারী গৃহের দাওয়ার এক প্রান্তে একা-কিনী বসিয়া এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, চৌবেড়িয়ার দিক্ হইতে সেই পথ দিয়া একখানি চৌপাল হন্ হন্ করিয়া আসিতেছে। ক্রমে চৌপালখানি তাঁহারই উঠানে আসিয়া স্থাপিত হইল। দেবনাথ-জননী শশব্যস্তে গৃহে প্রবেশ করিলেন। চৌপাল হইতে দেবল বাহির হইয়া বেহারাদিগকে বিদায় দিলেন। তখন বৃষ্টি থামিয়াছে। মেঘের ঘোরে সন্ধ্যাদেবী যত নিকটবর্ত্তিনী দেখাইতেছিলেন, দেখা গেল, বাস্তবিক তখন তত নিকটে আসেন নাই।

দেবনাথ পালের নাম ক্রমে "দেবলে" পরিণত হইয়াছিল। বাঙ্গালা শব্দের অপভ্রংশ-রীতি সময়ে সময়ে আমাদিগকে বিস্মিত করিয়া থাকে। প্রথমে দেবনাথ পালের "নাথ" ভাগ লোপ পাইয়া দেব পাল দাঁড়াইয়াছিল। ক্রমে "পালের" "পা" এই বর্ণটীও ধ্বংস পাইয়া "দেবল" মাত্র অবশিষ্ট রহিল। তৎকালীন শিশু-গণ,—যাহারা দেবনাথ নাম কখনও শুনে নাই,—তাহারা আবার "দেবল পাল" বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চৌবেড়িয়ার বুড়োশিবের মেলায় দেবনাথ হাঁড়ী কুঁড়ী বেচিতে যাইতেন। গল্পের এই অধ্যায়ে আমরা যে দিনকার ঘটনা বলিতেছি, সে দিনটী একটী মেলার দিন। দেবল ঐ দিন প্রাতে পর্য্যুসিতান্ন ভোজন করিয়া ঐ মেলায় গমন করেন। হাঁড়ী কলসী বোঝাই করা পাঁচ খানা গাড়ী তাঁহার সঙ্গে যায় এবং আপনার মাথাতেও প্রকাণ্ড এক ঝাঁকা উৎকৃষ্ট পাতলি হাঁড়ী ছিল।

কিন্তু যে কুম্ভকার প্রাতঃকালে উপরি-উক্ত সজ্জায় মেলায় মৃৎশিল্প বিক্রয় করিতে গমন করিল, সন্ধ্যার প্রাক্কালে সে রাজপুত্রের ন্যায় রিক্তহস্তে চৌপালে চড়িয়া গৃহে প্রত্যাগত হইল; বিক্রয়াবশিষ্ট কিছুই ফিরিয়া আসিল না। ব্যাপার টা কি?

দেবল চৌপাল হইতে অবতরণপূর্ব্বক বাহকগণকে বিদায় দিয়া "মা মা" শব্দে জননীকে ডাকিতে ডাকিতে মাতৃগৃহে প্রবেশ করিলেন এবং জননীকে কহিলেন,

"মা, তুমি বাহিরে বসিয়াছিলে, চৌপাল দেখিয়া ঘরের মধ্যে পলাইলে কেন? আমি যে চৌপালে করিয়া আসিলাম।" জননী কহিলেন,—

"বুড়োশিবের কৃপায়, এক দিনের বেচা কেনায় রাজা হইলি নাকি?"

"তুমি একে রাজার মেয়ে, আবার রাজার মা হইতে তোমার বড় সাধ হইয়াছে, তাই আজ রাজা হইয়া চৌপালে চড়িয়া বাড়ী আসিলাম।"

"আজিকার ঘটনা ও তোর আনন্দভাব দেখিয়া, আর কথাবার্ত্তা শুনিয়া, আমি অবাক্ হইতেছি। তোর মুখে এমন হাসি খুসীর কথা কখনও শুনি নাই;— যখন তোর মুখের দিকে চাহিয়াছি, তখনই মুখখানি বিষণ্ণ বই প্রসন্ন দেখি নাই। ভাল! আজিকার অবিক্রী হাঁড়ী কুঁড়ী এখনো ফিরিল না কেন?"

"সেইত আজিকার আসল কথা। তার পর বুড়োশিবের কথা,—তারপর মামার বাড়ীর কথা।"

(৭)

চৌবেড়িয়ার বুড়োশিবের সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণেই মাসে মাসে একদিন করিয়া মেলা হইয়া থাকে। এই মেলায় নানাস্থান হইতে বহুতর সামগ্রীর সমাবেশ হয়। বিশেষ হাঙ্গরীবাঁকের হাঁড়ী ক্রয়করণার্থ বহুসংখ্যক পাইকড়্ আসিয়া থাকে। আমরা ষষ্ঠাধ্যায়ে যে মেলার কথা পড়িয়াছি, সেই মেলার দিন বেলা তৃতীয় প্রহর অতীত না হইতেই, দেবলের সমস্ত হাঁড়ী, কলসী, পাত্‌লি ইত্যাদি যাহা যাহা ছিল, সমস্ত বিক্রয় হইয়া গেল। একজন পাইকড়, বিস্মৃতিক্রমে একটি টাকার পরিবর্ত্তে একটি মোহর দিয়া গেল। এরূপ খুঁটে ঝাড়া বিক্রয় এবং একগুণের স্থলে বিশগুণ প্রাপ্তি, এমন অসামান্য ঘটনা, বুড়োশিবের মেলায় কাহারও ভাগ্যে কখনও ঘটে নাই। দেবল সে দিন অন্যান্য সময়াপেক্ষা প্রায় দ্বিগুণ হাঁড়ী কুঁড়ী লইয়া গিয়াছিলেন। অন্যান্য মেলায় কোন দিন সিকি, কোন দিন অর্দ্ধেক দ্রব্য ফিরিয়া আসিত, অদ্য একটা ভাঙ্গা হাঁড়ী, বা কলসীও ফিরিল না। এক টাকার স্থলে একটী মোহর প্রাপ্তি— কিয়ৎক্ষণ পরে জানিতে পারিয়া, আগামী মেলায় মোহরটী তৎস্বামীকে প্রত্যর্পণ করিবেন কিনা, ভাবিতেছেন, এমন সময়ে "তোমার পাওনা, তুমি পাইয়াছ," ইত্যাদি শব্দ তাঁহার শ্রুতি স্পর্শ করিল। এইরূপ নবাঙ্কিত ন্যায় দ্বারাই দৈব মানুষকে সাময়িক শিক্ষা দিয়া থাকেন।

আজিকার মেলায় খুঁটিঝাড়া সমস্ত বিক্রয় হইয়া গেল এবং বিক্রয়ের লাভ ব্যতীত বিশিষ্টরূপ দৈবদানে দেবলের দেবভক্তির শ্রীবৃদ্ধি হইল। ললাটস্থ রাজদণ্ড সম্পর্কে দৈবজ্ঞ-বাক্য, শ্রীনগরের জঙ্গলে শিরে ধৃত ফণছত্র ইত্যাদি ঘটনা যেন আজ অস্থ আকার ধারণ করিয়া দেবলের মনোক্ষিসমীপে নৃত্য আরম্ভ করিল। আনন্দে অষ্টধা বিভক্তীভূত হইয়া বুড়োশিবের মন্দিরদ্বারে উপনীত হইলেন। গললগ্নীকৃতবাসে ভূমিষ্ঠ হইয়া ভক্তিভাবে দণ্ডবৎ আরম্ভ করিলেন। তখন প্রাঙ্গণস্থ পঞ্চ সহস্র লোকের মধ্যে আর এক জনেরও ক্রয় বিক্রয় শেষ হয় নাই। স্থতরাং দেবদ্বারে তৎকালে দেবল ভিন্ন অন্য জন প্রাণী ছিল না। মন্দির-মধ্য হইতে মেঘগর্জ্জনবৎ হঠাৎ অব্যক্ত গম্ভীর নিনাদ নির্গত হইতে লাগিল। ধূপধূনা-গুগ্‌গুল-চন্দন-চর্চ্চিত কুসুমগন্ধে দেবলের নাসারন্ধ্র পূর্ণ হইয়া গেল। দেবল চকিতনেত্রে চতুর্দ্দিকে চাহিতে লাগিলেন। ভয় ও ভক্তিভরে হৃদয় গম্ভীর হইল। দেহে রোমাঞ্চ প্রকাশ পাইতে লাগিল। স্বর্গধাম হইতে যেন কিন্নরকণ্ঠ-সমুত্থিত সঙ্গীতলহরীসহ মধুর-মুরজ মুরলীধ্বনি শ্রুতিগোচর হইতে লাগিল। অপাঙ্গে অশ্রু সঞ্চিত হইল। অল্পক্ষণ-মধ্যেই পূর্ব্বোক্ত অব্যক্ত গম্ভীর নিনাদ হইতে দেবল একটি স্থব্যক্ত বাণী শুনিতে পাইলেন;—

"দেবল, তুমি রাজা হইবে।" তাঁহার নাম ধরিয়া কে কোথা হইতে এই বাক্য বলিল, দেবল তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। কেবল অপার আনন্দে তাঁহার হৃদয় বিহ্বল হইতে লাগিল। দুই একপদ করিয়া পশ্চাৎ গমন করিতে লাগিলেন।

ভক্তির চতুঃষষ্টি অঙ্গ। তন্মধ্যে 'দেব-দণ্ডবদনন্তর পশ্চাদ্গমন অন্যতম।' বালক দেবল, এ সকল কিছুই জানেন না। কিন্তু আজ স্বয়ং ভক্তি দেবী তাঁহাকে ভক্তাচার শিক্ষা দিলেন। ঐরূপে সাত আট হাত পশ্চাৎ গমন করিয়া তবে পরাঙ্মুখ হইতে সাহস হইল। পরাঙ্মুখ হইবামাত্র একটি পরমস্থন্দর সমবয়স্ক যুবা দেবলের হস্ত ধারণ করিলেন। দেবলের হস্ত ধরিয়া গ্রামের অভ্যন্তরাভিমুখে গমন করিতে করিতে উভয়ে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। সেই কথাবার্ত্তার কিয়দংশ পাঠক পাঠিকা-গণকে শ্রবণ করিতে হইবে। কারণ তাহার সহিত এই আখ্যায়িকার একটু সংস্রব আছে, এবং এই গল্পের যে অংশের বিকাশ-চেষ্টা ষষ্ঠাধ্যায় হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ঐ কথোপকথন তাহারও সহিত সংস্পৃষ্ট।

আগন্তুক যুবা দেবলের হাত ধরিয়া গ্রামমধ্যে যাইতে যাইতে কহিলেন,—

"দেবল, তোমার ন্যায় একরোখ (এক-রোকা) ও তেজস্বী মানুষ আমি দেখি নাই। আমার একটা কথার দোষে তুমি তিন বৎসর আমাদের বাড়ী যাও নাই। তিন চারি খানা গাঁয়ের কুমারে এখানকার মাটী

লইতে আসে, কেবল তুমি আস না। পাছে আমাদের বাড়ী যাইতে হয়, কি—আমাদের সঙ্গে মুখ দেখাদেখি হয়, এজন্ত চৌবেড়ের তিনের হাট বন্ধ করিয়াছ। তুমি আস না বলিয়া পিতা মাতা কতই দুঃখ করেন। এই ঘটনার মূল আমি, এজন্ত তাঁহাদের চক্ষের বিষ হইয়াছি। বাপ আমার,—আমার সকল দোষ মার্জ্জনা করিয়া আজ আমাদের বাড়ী যাইতে হইবে।" এই সকল কথা বলিতে বলিতে দেবলের হস্তধারী যুবক অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। আজ দেবভক্তিতে দেবলের হৃদয় দেবভাব ধারণ করিয়াছে, 'বজ্রাদপি' কঠোর দেবল 'কুসুমাদপি' মৃদু হইয়াছেন, পূর্ব্বের প্রবল আত্মাভিমান, ক্রোধ, জিদ প্রভৃতি সকলই দূরে গিয়াছে, হৃদয়ে সরলতার ঢেউ খেলিতেছে। কহিলেন,—

"ছোট মামা, দোষ তোমার নহে, দোষ আমার। তুমিত ঠিক্ কথাই বলিয়াছিলে। তুমি রাজপুত্র, আমি দুঃখিনীর ছেলে,—বিশেষ হাঁড়ীগড়া কুমার। আমার সঙ্গে একঘরে খাইলে কি তোমার মান থাকে? আমিই গণ্ডমূর্খ, তাই সেই কথায় রাগ করিয়া আজ তিন বছর তোমাদের মুখ দেখি নাই। বিশেষ দাদা দিদির কাছে আমার অপরাধের অন্ত নাই। চল, আজ তাঁদের চরণ দর্শন করিয়া আসি।" দেবল এই কথা কয়টী বলিয়া সত্বর কনিষ্ঠ মাতুলের হস্ত হইতে নিজ হস্ত আচ্ছিন্দনপূর্ব্বক তাঁহার পদধূলি লইলেন এবং মাতুলালয়ের সমস্ত সংবাদ জিজ্ঞাসা করিতে করিতে মাতুলালয়ে গমন করিলেন। মাতামহ, মাতামহী, মাতুলানীগণ আজ দেবলকে দেখিয়া যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। কত যত্ন ও কতই আদর করিলেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। দেবল আজ মাতুলালয়স্থ সমস্ত নরনারীর ভাব এবং তৎপ্রতি তাঁহাদের অভূতপূর্ব্ব স্নেহাদর দর্শনে ভাবিতে লাগিলেন,—

"এককালে যে দেবল হাঁড়ীগড়া ছোট জাতি বলিয়া মাতুলালয়ে লাঞ্ছিত ও অবজ্ঞাত হইয়াছিল, আজ সেই দেবলের প্রতি মাতুলালয়ের একি ভাব? বোধ হয়, কোনরূপে দেবদ্বারের দৈববাণী ইহাঁরাও শ্রবণ করিয়াছেন এবং তাহাতে ইহাঁদিগের সম্পূর্ণ বিশ্বাসও জন্মিয়াছে। নতুবা আমার প্রতি ইহাঁদিগের এরূপ ভাব কখনই হইতে পারে না।" অনন্তর দেবল মাতামহ, মাতামহী ও অন্যান্ত গুরু জনের চরণধূলি লইয়া বিদায় প্রার্থনা করিলেন। এই সকল ঘটনার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্ব হইতেই বারিবর্ষণ ও মেঘগর্জ্জন আরব্ধ হইয়াছিল। তজ্জন্য দেবল এই দুর্যোগে হাঙ্গরীবাঁক্ গমনে সকলের দ্বারাই সবিশেষ নির্ব্বন্ধ-সহকারে নিষিদ্ধ হইলেন। কিন্তু আজ যেরূপ দুর্যোগ, তাহাতে গৃহে গমন না করিলে মাতা অতিশয় উদ্বিগ্ন হইবেন। তিনি মাতুলালয়ে আসিয়াছেন, পরম সুখে আছেন, মাতা কিছু সে সংবাদ পান নাই।

অতএব অবিলম্বে গৃহে প্রস্থান করা নিতান্ত আবশ্যক। সকলে এই যুক্তিটী সঙ্গত মনে করিয়া চৌপাল আনাইয়া দিলেন। সেই জন্যই আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে "হাড়ীগড়া ছোট জাতিকে" পাঠকগণ চৌপালারোহণে গৃহে সমাগত দেখিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গীয় মহাত্মা হামারগ্রেণ।

ইউরোপের উত্তর প্রান্তে সুইডেন-নামক চির-তুহিনাবৃত প্রদেশে মহাত্মা হামারগ্রেণ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অত্যন্ত দরিদ্র ছিলেন। শিশুকাল হইতেই তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা বলবতী ছিল। তাঁহার স্বদেশে বিদ্যালয় ছিল না, সুতরাং বিদ্যাশিক্ষার জন্য নিজ গৃহ হইতে প্রায় ২০ মাইল দূরে দুরারোহ পর্ব্বতশ্রেণী ও বরফরাশি অতিক্রম করিয়া যাইতে হইত। ইঁহাদের পরিবারিক দারিদ্র্য স্মরণ করিলে পাষাণহৃদয়ও বিগলিত হয়, কিন্তু এত দারিদ্র্য সত্ত্বেও জ্ঞান-পিপাসা চরিতার্থ করিবার জন্য,অনন্ত দুঃখরাশি বুক প্যাতিয়া লইতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন—এমন কি এত বিপদের ভিতরেও তিনি ৪৫ টী ভাষা সুন্দররূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। ইঁহা-দের পরিবারস্থ সকলেই খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী এবং ইঁহার পিতা খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক ছিলেন। নানা প্রকার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তক অধ্যয়ন করিবার পরে তাঁহার মনে বাই-বেলের প্রতি অবিশ্বাস জন্মিতে লাগিল। এই প্রকার সন্দেহের মধ্যে পতিত হইয়া তিনি নিরতিশয় মানসিক কষ্টে দিনাতি-পাত করিতে লাগিলেন, কারণ দেশবাসী এবং পরিবারস্থ সকলেই খৃষ্টান্—কেবল তিনিই স্বীয় পৈতৃক ধর্ম্মের বিরোধী। এই সময়ে প্রকৃত ধর্ম্ম লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া নানাবিধ ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্ত হইলেন। যদিও তিনি খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া খৃষ্টীয়মণ্ডলী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইলেন, তথাপি কখনও ঈশ্বরকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হন নাই। কিছুদিন পরে আরও কয়েকটী স্বদেশীয় যুবক তাঁহার সহিত সম্মিলিত হইলেন। ইঁহারা সকলেই ধর্ম্মালোচনা, নির্জ্জন প্রার্থনা, সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ও সদা-লোচনায় সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিতেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে, এই সময়ে তাঁহার মানসিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। নানা প্রকার হিংস্রজন্তুপরিপূর্ণ অরণ্যে পথিক পথভ্রষ্ট হইলে যেরূপ দুর্দ্দশাপন্ন হয়, ইনিও ধর্ম্মজগতে পথ-ভ্রষ্ট হইয়া সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইলেন।

তাঁহার জীবনের এইরূপ ঘোর সমস্যা ও পরীক্ষার সময়ে তিনি কোন এক সংবাদপত্রে পাঠ করিলেন যে, ভারত-বর্ষে 'ব্রাহ্ম' নামে এক ধর্ম্মসম্প্রদায় আছে,

তাঁহারা আধ্যাত্মিকভাবে একেশ্বরের উপাসনা করেন, কোন দেবতা বা উপদেবতার প্রতিমূর্ত্তি পূজা করেন না। ইহা পাঠ করিয়া তিনি পূর্ব্ব দিকে আশার আলোক দেখিতে পাইলেন। সেই সময় হইতেই তিনি ব্রাহ্মসমাজের সংবাদ জ্ঞাত হইবার জন্ত ব্যস্ত হইলেন।

কিছুদিন পরে একখানি ফরাসী পুস্তকে ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্ত অবগত হইলেন। তাঁহার তখন মনে হইতে লাগিল যে, ব্রাহ্মসমাজ তাঁহারই সমাজ এবং ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকাগণ তাঁহারই ভ্রাতা ভগ্নী। বিদেশী হইয়াও এত দূরবর্ত্তী ব্রাহ্মসমাজস্থ লোকদিগের প্রত্যেকের চরিত্র, এমন কি কে কি কার্য্য করেন তাহাও অবগত হইতে লাগিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ডে যাইবার জন্তও তাঁহার আন্তরিক ঔৎসুক্য জন্মিল। যদিও দরিদ্রতাবশতঃ প্রথমতঃ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, তথাপি তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও আশা কিছুতেই বিচলিত হয় নাই। কিছু দিন পরে প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া অতি কষ্টে জন্মভূমি সুইডেন পরিত্যাগপূর্ব্বক ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা করিলেন। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই সময়ে ইংলণ্ডে ছিলেন; এই স্থানে তাঁহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল। তাঁহার এই সময়ের আর্থিক দুরবস্থার কথা বর্ণনাতীত। তিনি স্বীয় দুঃখ, কষ্ট ও দারিদ্র্যের কথা কাহারও নিকটে প্রকাশ করিতে ভাল বাসিতেন না। ইংলণ্ডগমনের পর তিনি কুমারী কলেটের ব্রাহ্ম (Year-Book) বার্ষিকী পাঠ করেন এবং তথাকার ব্রাহ্মসমাজে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন। ইংলণ্ডে ৫ বৎসর বাস করিয়া ইংরাজী ভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা করেন এবং একটী পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষতা করিয়া কিছু অর্থও সংগ্রহ করেন। অতঃপর ভারতবর্ষে আসিবার জন্ত ইচ্ছা জন্মিল; কিন্তু অর্থাভাবে তাহা ঘটিয়া উঠিল না। অন্ত কেহ হইলে ইহাতেই নিরুৎসাহ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িত, কিন্তু তিনি সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না। বহু চেষ্টার পর ও অসহনীয় দারুণ কষ্ট সহ্য করিয়া তিনি ভারতবর্ষে আগমন করিলেন।

রাজা রাম মোহন রায়ের প্রতি তাঁহার অটল ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল। রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজ ও তাঁহার দেশবাসীদিগকে দর্শনই তাঁহার আগমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। রাজা রাম মোহন রায়ের প্রতি তাঁহার ভক্তি এত গভীর ছিল যে, তিনি যে বাড়ীতে থাকিতেন, প্রতিদিন সেই বাড়ীটী একবার করিয়া প্রায়ই দেখিতে যাইতেন। আদিসমাজের উপাসনার ভাষা কিছুই বুঝিতে পারিতেন না, তথাপিও রাজা রাম মোহন রায়ের সমাজ বলিয়া সেই স্থানে যাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতেন। রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ একটী লাইব্রেরী করিবার জন্ত তিনি অনেককে অনুরোধ ও নিজে সাধ্যমত ক্লেশও স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্ত

দুঃখের বিষয় এই যে, তাঁহার প্রাণের এই আশা পূর্ণ হয় নাই। কেহই জানিতেন না যে, তিনি এত সংকীর্ণ সময়ের জন্য এ সংসারে থাকিবেন। অনেক সময় তিনি দুঃখ করিয়া বলিতেন যে, "হায়! রাজা রামমোহন রায়ের বাসস্থান কি ব্রাহ্ম সমাজ ক্রয় করিতে পারেন না?"

ছোট ছোট শিশুদিগকে তিনি প্রাণের সহিত ভালবাসিতেন এবং বেড়াইতে যাইবার সময়ে দুই পকেট ভরিয়া পয়সা লইয়া যাইতেন। যেখানে একদল দরিদ্র বালক বালিকা দেখিতে পাইতেন, সেই-খানেই পয়সাগুলি ছড়াইয়া দিতেন, তার পর যখন তাহারা পরস্পরে কাড়াকাড়ি করিয়া লইত, তখন তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকিত না।

মহাত্মা হামারগ্রেণ বাহ্যাড়ম্বর ভাল বলিতেন না। সর্ব্বদা সকলকেই বলিতেন, "ভাই, এ দেশে অনেকেই মুখে অনেক কথা বলেন, কিন্তু কার্য্যে কেহই কিছু প্রদর্শন করেন না; এস, আমরা কার্য্যে জীবনের পরিচয় দিই, মুখে ব্রাহ্ম বলিবার দরকার কি?" বাস্তবিকই দেখা গিয়াছে, যদি তাঁহাকে কোনও দিন ছাত্রসমাজে কিছু বলিবার জন্য অনুরোধ করা হইত, তিনি সবিনয়ে অস্বীকার করিতেন।

তাঁহার কোন কার্য্যে উৎসাহ দিবার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। একদা তিনি বামাবোধিনী-সম্পাদকের বাড়ীতে গিয়া-ছিলেন। সেখানে "বামাবোধিনী" পত্রিকা দেখিয়া তাহার সমস্ত বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং যখন শুনিতে পাইলেন যে, স্ত্রীলোকদিগের শিক্ষার জন্য উক্ত পত্রিকা প্রকাশিত হয়, তৎক্ষণাৎ এক বৎসরের অগ্রিম মূল্য প্রদান করতঃ তাহার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হইলেন, অথচ তিনি বাঙ্গালা ভাষা কিছুই জানিতেন না।

কলিকাতায় আসিয়া তিনি একজন শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্ম বন্ধুর বাড়ীতে বাস করিতেন। তিনি সেখানে তাঁহার চরিত্রের এত মাধুর্য্য দেখাইয়াছেন যে, তাঁহা-দের পরিবারের প্রত্যেক লোক, ব্রাহ্ম সমাজের প্রত্যেক লোক, রাজপথের দরিদ্র বালকগণ এবং যাঁহারা সহিত অন্ততঃ একদিনের জন্যও কথা বলিয়া-ছেন, তিনিও বিমোহিত না হইয়া থাকিতে পারেন নাই। এখানে আসিয়া তিনি লাটিন, জর্ম্মণ, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা দিয়া অনেক অর্থোপার্জ্জন করিতে লাগিলেন। অন্য কোন লোক হইলে এত দরিদ্রতার পর অর্থোপার্জ্জন করিয়া হয়ত বিলাসী হইয়া পড়িতেন। কিন্তু তিনি সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। দরিদ্র হইলে যে কি প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে হয়, তাহা তিনি বিলক্ষণ জানিতেন, সুতরাং তিনি স্বোপার্জ্জিত টাকাগুলি প্রাণের যত্নের সহিত দরিদ্র-দিগকে দান করিতেন।

মহাত্মা হামারগ্রেণ বিদেশী হইয়াও আমাদের দেশকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন, দেশীয় খাদ্য অনেক সময় তৃপ্তিপূর্ব্বক ভোজন করিতেন, দেশীয়দিগের সহিতই

মিশিয়া থাকিতেন এবং এ দেশের জল-বায়ু তাঁহার স্বাভাবিক হইবে বলিয়া রাস্তায় মাঠে ঘাটে রৌদ্রে বৃষ্টিতে সর্ব্বদাই বেড়াইতেন। কতকাল তিনি এ দেশে থাকিবেন, জিজ্ঞাসা করিলে মধুর হাস্য করিতেন, তাহাতে বোধ হইত এ দেশ ছাড়িয়া যাইতে তাঁহার ইচ্ছা নাই। কালের গতি! হঠাৎ তিনি আমাশয় রোগে আক্রান্ত হইলেন এবং ৪।৫ দিনে তাহাই সাংঘাতিক হইয়া দাঁড়াইল। যে বাঙ্গালী বন্ধুর বাড়ীতে তিনি ছিলেন, তাঁহারা সপরিবারে পরমাত্মীয়ের ন্যায় তাঁহাকে মমতা করিতেন—কোনও সেবাশুশ্রূষার ত্রুটি করেন নাই। পীড়িত অবস্থায় তাঁহাকে "কেমন আছেন?" জিজ্ঞাসা করিলেই বলিতেন "আমি ভাল আছি, আমার কোনও অভাব নাই।" তাঁহার আত্মা দেহত্যাগ করিলেও তাঁহার পবিত্র প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া সকলে মুগ্ধ হইয়াছিল। ব্রাহ্ম বন্ধুগণ ঈশ্বরোপাসনা-পূর্ব্বক তাঁহার শবদেহ স্কন্ধে করিয়া কলিকাতার নিমতলাঘাটে লইয়া যান এবং তথায় চিতাগ্নিতে তাহা ভস্মসাৎ হয়। কলিকাতায় ইউরোপীয়ের অগ্নি-সংস্কারের বোধ হয় এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

হামারগ্রেনের জীবনে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ হস্ত প্রত্যক্ষ হয় এবং বাঙ্গালীদিগের সহিত তাঁহার মধুর সম্মিলন ও তাহাদের জন্য তাঁহার প্রাণদান চিরস্মরণীয়।

প্রভাতী।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

চৈত্রসংক্রান্তির প্রখর রৌদ্র গাছের উপর ঝাঁ ঝাঁ করিতেছে, পদ্মগন্ধে সুরভিত সরোবর-সলিলে সরোজদলের পল্লবচ্ছায়ায় বসিয়া হংস সকল বিশ্রাম উপভোগ করিতেছে, বনের ভিতর গাছের তলে তলে আরণ্য মৃগ-মিথুনেরা নীরব নিস্পন্দভাবে চরিয়া বেড়াইতেছে। সেই সময় একটী কোকিল-কাকুলিত গভীর বনের ভিতরে একটী নবীন বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া মধুমতী; তাহার সাক্ষাৎ সৌভাগ্য দেবীর ন্যায় প্রভাতী তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। মধুমতী কাঁদিয়া কাঁদিয়া, কাঁপিয়া কাঁপিয়া, থামিয়া থামিয়া কহিল "প্রভাতি, এখানে এসে বস।"

প্রভাতী। আমি সচ্ছন্দে দাঁড়াইয়া আছি, তুমি এখন অকপট হৃদয়ে তোমার দুঃখের কাহিনী বর্ণনা কর। আমি আশা করি, তুমি আমার নিকট কিছুই গোপন করিবে না, ও করিবারও কিছু নাইও। তোমার কোষ্ঠীর ফল গণনা করিয়া পিতা মাতা তোমার ষোড়শ বৎসর উত্তীর্ণ না হইলে বিবাহ দিবেন না সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাহাতে তুমি আন্তরিক সন্তুষ্ট ছিলে। আমি জানি, শীঘ্রই তোমার ষোড়শ বৎসর উত্তীর্ণ হইবে। অতএব

শীঘ্রই উপযুক্ত স্বামী লাভ করিয়া সুখী হইবে। হঠাৎ তোমার এ দুঃখ বিমর্ষতার কারণ কি? খুলিয়া বল।

মধুমতী নীরবে অনেকক্ষণ কাঁদিল। তারপর কহিল "আজ বলিব বলিয়া প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছি, তুমি জানিও আমার জীবন অল্প দিনেই শেষ হইবে।"

প্রভাতী তাহার অর্থ কিছুই বুঝিতে পারিল না, কেবল তাহার মুখের উপর ঘন ঘন শূন্য দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল ও অসাধারণ বিজ্ঞতার সহিত তাহার হৃদয়ের ভাব গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু সে বড় কষ্টকর—বড় কঠিন, যাহা বুঝিতে পারিল তাহাতে সে অস্থির হইয়া কহিল "মধুমতি, প্রাণের মধুমতি! বল বল, বিলম্ব করিও না, বলিয়া আমার মনের উদ্বেগ দূর কর।"

প্রভাতীর মুখ হইতে এই কথা বাহির হইবামাত্র মধুমতী বায়ুবিকম্পিত লতিকার ন্যায় কম্পিতহস্তে বস্ত্রাবরণ হইতে স্বহস্তলিখিত একখানি চিত্র বাহির করিয়া প্রভাতীর হস্তে দিল। প্রভাতী সেই মধুময় চিত্রখানি হস্তে লইয়াই সমস্ত কথা বুঝিতে পারিল। তাহার বহুদিন-কার মনের ধাঁধা ঘুচিয়া গেল। বায়ু-কম্পিত বাপীর ন্যায় তাহার সমস্ত হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল। আলোক নির্ব্বাপিত হইলে গৃহ যেমন হঠাৎ গাঢ় অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়, তাহার মনেরও সেই রকম অবস্থা হইল। কিন্তু সেই মহিমাময়ী রমণী অসাধারণ ধৈর্য্যের সহিত চিত্রখানি চুম্বন করিয়া হৃদয়ে ধরিতে গেল ও মধু-মতীকে উৎসাহ দিতে গেল, কিন্তু সে বড়ই কঠিন কাজ, দুঃখে কষ্টে তাহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সে আর সহ্য করিতে পারিল না—ক্ষণকাল মধ্যেই মুর্চ্ছিত হইয়া ভূমিতলে নিপতিত হইল।

প্রভাতীর কষ্ট দেখিয়া মধুমতীরও হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল। সেও তৎক্ষণাৎ প্রভাতীর পার্শ্বদেশে নিপতিত হইয়া মূর্চ্ছিত হইল। তারপর মধুমতীর যখন চৈতন্য হইল, তখন দেখিল সে আপন শয়নকক্ষে শায়িত, প্রভাতী তাহার নিকট বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছে, প্রভাতীর ছেলেটী প্রভাতীর কাছে বসিয়া খেলা করিতেছে, আর মেয়েটী তাহার পায়ের কাছে বসিয়া অতি মধুরকণ্ঠে গান করিতেছে।

"তোর নাম রেখেছি হরিবোলা।
মনের সাধে ও আমার মন খেল না
হরিনামের খেলা।
প্রেমে মাখি ভক্তিমাটী, গড় না হরির
চরণদুটী,
আয় দুজনে সেই চরণে পরিয়ে দিই
বনফুলের মালা।"

অনেক শুশ্রূষায় অনেকক্ষণে মধুমতী কিছু সুস্থ হইল দেখিয়া প্রভাতী মুক্তকণ্ঠে কহিল "মধুমতি! তোমার সুখের জন্য আমার নিজের সুখে কুঠারাঘাত করিতে প্রস্তুত হইলাম।" মধুমতী দেখিল তাহার জন্য তাহার একমাত্র হৃদয়ের বন্ধুর সমস্ত সুখের মূলে কুঠারাঘাত পড়িতেছে, দুঃখে

ক্ষোভে তাহার কোমল হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। সে উপাধানে মুখ লুকাইয়া দুই হস্তে বুক চাপিয়া কেবলই কাঁদিতে লাগিল। প্রভাতী কহিল "তুই কাঁদিস্ কেন? আমাদের উভয়ের মধ্যে যেরূপ বন্ধুতা আছে, তাহা বিধাতা বুঝি এই ঘটনা দ্বারা আরও সুন্দর, আরও মধুর করিতে চেষ্টা করিতেছেন। আমি জানি তুমি আমরাই দুঃখের জন্য কাঁদিতেছ, তুমি বিশ্বাস কর ইহাতে আর আমার বিশেষ কোন কষ্ট নাই।"

অতি ধীরে ধীরে মধুমতী কহিল "আমার জন্য তোমার বেশী কিছু করিতে হইবে না, কারণ মৃত্যু আমার নিকটবর্ত্তী হইতেছে।" প্রভাতী বুঝিল যে, তাহার জন্যই মধুমতী সংসার ছাড়িয়া যাইতে চাহিতেছে, কিন্তু তাহাকে যাইতে দেওয়া হইবে না—ভাবিতে ভাবিতে ছেলেটীকে কোলে লইয়া মেয়েটীর হাত ধরিয়া মধুমতীর নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিজগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

গম্ভীর অথচ ঈষৎ রুষ্টভাবে প্রভাতী অনিলকে কহিল "তোমাকে এখন অন্যমনস্ক দেখিতে পাই কেন?" গম্ভীর মুখে ঈষৎ হাস্যরেখা অঙ্কিত করিয়া অনিল কহিল "কই, এ তোমার বৃথা কল্পনা।"

প্রভাতী। যদি বৃথা কল্পনা হইত, তবে আমাকে সৌভাগ্যবতী মনে করিতাম। কিন্তু সে কথা পাড়িবার এখন সময় নয়। মধুমতীর অবস্থা বড় শোচনীয় দেখিয়া আসিলাম। তাহার বিবাহের যে প্রতিবন্ধকতা আছে, তাহা তুমি সকলি জান; কিন্তু সে ষোড়শ বৎসর উত্তীর্ণ না হইতেই একজন দ্বাবিংশ বৎসরের যুবা পুরুষকে হৃদয় দান করিয়াছে। সে বড় কঠিন সমস্যা হইয়াছে—সে যাহাকে ভাল বাসিয়াছে, তাহার সঙ্গে তাহার বিবাহ কিছুতেই সম্ভবে না। কিন্তু আমি তোমার সাহায্যে সে কার্য্য সাধন করিব ভাবিয়াছি, কারণ রমণীর মনের দুঃখ রমণীই বুঝিতে পারে। সে যাহাকে ভাল বাসিয়াছে, প্রকাশ্যে তাহার সহিত বিবাহ হইলে তাহাকে জাতিচ্যুত হইতে হইবে। কিন্তু তাহাকে না পাইলেও মধুমতীর সুখের সম্ভাবনা নাই। সাধ্বীরা যাহাকে হৃদয় দান করে, সেই তাহাদের জীবন মরণে পতি হয়, হয়ত সে অন্য লোকের হস্তে পড়িবার ভয়ে জীবনও ত্যাগ করিতে পারে। আমি গোপনে তাহার উদ্দেশ্য সফল করিব, তুমি আমার সহায় হও।

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া অনিল কহিল "সে আবার কি?" অনিলের মুখে একটী বিষাদের ছায়া পড়িল লক্ষ্য করিয়া অনিচ্ছার হাসি হাসিয়া প্রভাতী কহিল "তোমাদের নিকট আমার জীবন বলি দিব। তুমি ভয় পাইও না, ব্যস্ত হইও না, গোপনে আমার সাহায্য করিবে কি না বল?" অনিলের মনের বিষাদের ছায়া অপসারিত হইল না, কিন্তু তেজস্বিনী প্রেয়সীর গম্ভীর কণ্ঠস্বরে সে ক্ষণকাল

কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিল। তার পর যেন নিজের অজ্ঞাতসারে কহিল "কি করিতে হইবে বল?" প্রভাতী ধীরে ধীরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া কহিল "কহিব! আর কি? যাহা করিতে বলি আমার সঙ্গে সঙ্গে নীরবে তাহাই করিও, তাহার পর স্খলিত নক্ষত্রের ন্যায় প্রভাতী স্বামীর কোলের উপর গিয়া পড়িল এবং কোমল বাহুলতা দ্বারা স্বামীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া তাহার পবিত্র মুখ ঘন ঘন চুম্বন করিতে করিতে অস্পষ্টস্বরে কহিল "প্রাণাধিক! কাঙ্গালিনীর একমাত্র ধন অনিল, তুমি কি মধুমতীকে ভালবাস?"

অনিল তখন এত অন্যমনস্ক ছিল যে, প্রভাতীর কথা তাহার কর্ণে প্রবেশ করিল না। সে কলের পুত্তলিকাবৎ প্রভাতীর মুখ মুছাইয়া ও চুম্বন করিয়া কহিল "প্রভাতী তুমি মধুমতীর কথা কি কহিলে?" প্রভাতী দেখিল তাহার কপাল ভাঙ্গিয়াছে, সে তখন আন্তরিক দুঃখে দুঃখিত হইয়া কহিল, "আমার বিশ্বাস, তুমি মধুমতীকে ভালবাস। প্রিয়তম, তুমি কেন এমন হইলে? মধুমতীকে ভালবাসিলে কেন? মধুমতী সহস্র আত্মীয় হইলেও তুমি আমার, তাহাকে মনে কেন স্থান দিলে?" প্রভাতী আর কথা কহিতে পারিল না, বজ্রাহত লতার ন্যায় স্বামীর কোলের উপর পড়িয়া লুটাইতে লাগিল। প্রভাতীর কথা শেষ হইলেই অনিল বুঝিল যে, মধুমতীর ভালবাসার পাত্র যে নিজে। তখন তাহার মনের ভাবান্তর হইতে লাগিল। সেই মুহূর্ত্তে তাহার নিকট পৃথিবী স্বর্গশোভা ধারণ করিল, কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যানী নন্দনবনে পরিণত হইল, তাহার সেই বিষাদক্লিষ্ট মলিন মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল, সে মনের সুখে অস্থির হইয়া প্রভাতীকে বুকের মধ্যে টানিয়া কহিল "প্রভা! প্রভা! পৃথিবীতে এমন কি শাস্তি আছে যাহাতে, আমার মত লোকের প্রায়শ্চিত্ত হয়? আমি তোমার মনে কষ্ট দিয়া দারুণ অপরাধে অপরাধী হইতেছি।"

ওঃ, অনিল! কি কথা কহিলে, একটা বারও অস্বীকার করিলে না। প্রথমেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের কথা পাড়িলে? ইহাতে কি বুঝা যায় না যে, তুমি প্রভাতীকে ভুলিয়া মধুমতীকে ভালবাসিয়াছ! প্রভাতীর শুষ্ক কম্পিত অধর কি কহিতে গিয়া কহিতে পারিল না, তাহার মনের মধ্যে তখন নানা ভাবের উদয় হইতে লাগিল। হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ, ভয়, সংশয়, প্রেম, ধর্ম্ম, ভালবাসা, স্বার্থপরতা, পরার্থপরতা, এই সকল ভাব একত্র হইয়া মহা যুদ্ধ বাধাইল। এই ভাবে অনেকক্ষণ চলিল। অনিল নীরব নিঃস্পন্দভাবে পাষাণের ন্যায় বসিয়া প্রভাতীর সেই সুন্দর মুখখানিতে নানাভাবের লক্ষণ পরিলক্ষিত করিতে লাগিল—একটী মাত্র কথাও কহিল না। পুরুষ যে এমনতর কঠিন হইতে পারে, প্রভাতী জীবনে তাহা এই প্রথম জানিতে পারিল। প্রভাতী

স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া আকাশের দিকে চাহিয়াছিল। সন্ধ্যার আকাশ বড় নির্ম্মল, হুহু করিয়া বাতাস বহিতেছে, ছোট ছোট কাল রঙ্গের পক্ষীগুলি উড়িয়া উড়িয়া খেলা করিতেছে, যেন বায়ুর সমুদ্রে তৃণগুচ্ছ ভাসিয়া বেড়াইতেছে, ক্বচিৎ দুই একটী কোকিল পাখী বায়ু-সমুদ্রে অঙ্গ ভাসাইয়া, "চোখ গেল চোখ গেল, বৌ কথা কও বৌ কথা কও" গান করিতে করিতে দিক্ হইতে দিগন্তরে উড়িয়া যাইতেছে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কাল পাখীটীকে দেখা যাইতেছে, প্রভাতী ততক্ষণ চাহিয়া দেখিতেছে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই সঙ্গীতধ্বনি শুনা যাইতেছে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রভাতী তাহা শুনিতেছে। শুভ্র বলাকাবলি শ্রেণীবদ্ধ হইয়া আকাশ-পথে উড়িয়া বেড়াইতেছে। প্রভাতী শূন্য মনে শূন্যদৃষ্টিতে এই সব দৃশ্য বহুক্ষণ দেখিয়া চক্ষু মুদিত করিল। ক্ষণকাল মধ্যে সন্ধ্যার গাঢ় ছায়ায় দশ দিক্ আচ্ছন্ন হইল। অন্যমনস্ক অনিল পাষাণবৎ বসিয়া তাহার কোলে মুদ্রিতনেত্রা প্রভাতীকে দেখিতে দেখিতে সমস্ত রজনী প্রভাত করিল, একটীবারও নড়িল না বা উঠিল না।

(ক্রমশঃ)

স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র দত্তের জীবনচরিত।*

স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র দত্ত সন ১২৪৩ সালে জন্মগ্রহণ করেন; জাতিতে তন্তুবায়, গোত্র অলংঋষি। ইঁহার পিতার নাম ৺ দীননাথ দত্ত, পিতামহের নাম ৺ দুর্গাচরণ দত্ত। দুর্গাচরণ হইতে ঊর্দ্ধে অষ্টম পুরুষ ৺ গণেশচন্দ্র দত্ত ১৭০০ সম্বতের প্রারম্ভে বারেন্দ্র ভূমি ত্যাগ করিয়া, সূতা ও বস্ত্রব্যবসায়ী শেঠ ও বসাক (বশুক) দিগের সহিত বাণিজ্য উপলক্ষে গোবিন্দপুরে আসিয়া প্রথম বাস করেন। ইংরাজেরা দুর্গনির্ম্মাণের জন্য ঐ স্থান গ্রহণ করিলে ৺ গনেশ চন্দ্রের বংশধরেরা কলিকাতা বড়বাজার, পাথুরিয়াঘাটা, নিমতলা ষ্ট্রীট ও সিমলা প্রভৃতি স্থানে উঠিয়া আসিয়া বাস করেন। তাঁহারা ৺ দুর্গাচরণ দত্তের নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটস্থ বাটীতে বাস করিতেন। পরে উক্ত বাটী বিক্রয় করিয়া, যোড়া বাগান, হরলাল দাসের লেনস্থ ৯নং বাটী ক্রয় করেন। ঐ বাটীতে ৺ নবীন চন্দ্র দত্তের জন্ম হয়। পরে তিনি নিজে ১৩নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটে বাটী নির্ম্মাণ করাইয়া বাস করিতেছিলেন।

ইনি বাল্যাবস্থায় গরাণহাটা গঙ্গাধর রায় বসুর পাঠশালে ৺গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় গুরুমহাশয়ের নিকট প্রায় পাঁচ বৎসর কাল শুভঙ্করী ও তদানীন্তন বাঙ্গালা এক প্রকার

* বামাবোধিনী ইহার প্রাচীন বন্ধু ও প্রবন্ধ-লেখক বাবু নবীনচন্দ্র দত্তকে হারাইয়া বিশেষ শোকার্ত্ত হইয়াছেন এবং সাদরে তাহার পুত্রের লিখিত তাহার জীবনীকে আপনার অঙ্কে স্থান দান করিতেছেন। স।

শিক্ষা করিয়া ৺ গোপালচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট চাণক্য শ্লোক, হিতোপদেশ ও মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ কিঞ্চিৎ শিক্ষা করিয়া ফ্রিচার্চ ইনষ্টিটিউসনে প্রবিষ্ট হন। এখানে ১১ বৎসর কাল বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। প্রায় প্রতিবৎসর শ্রেণীর নির্দ্দিষ্ট পুরস্কার, এতদ্ভিন্ন বাৎসরিক স্বতন্ত্র পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ডাক্তার ডফ, রেভারেণ্ড ইউয়ার্ট সাহেব ও লালবিহারী দে প্রভৃতি অধ্যাপক মহাশয়গণ ইহাঁকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন এবং প্রশংসাসূচক পত্র দিয়াছিলেন।

সন ১২৬৫ সালে ইউয়ার্ট সাহেবের সুপারিস্ পত্রে, মান্যবর ৺ক্ষেত্রমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়, সিভিল অডিটর আফিসে, ইহাঁকে একটী ১৫ টাকার কর্ম্ম করিয়া দেন। বৎসর তিন পরে উক্ত আফিস, বেঙ্গল একাউনটেণ্ট জেনারল আফিসের সহিত মিলিত হইয়া যায়। এই একাউণ্টেণ্ট জেনারল আফিসে, ক্রমশঃ বেতন বৃদ্ধি হইয়া, তত্ত্বাবধায়কের (Superintendent) প্রাপ্ত হইয়া, প্রায় ৩০০ টাকা বেতনে, বাং ১২৯৭ সালে ৩২ বৎসর কর্ম্ম করিবার পর অবসর গ্রহণ করেন। মিঃ আর, সি, টলে ডবলিউ, সি, মেকলাউ, সি, এফ, এটকিন্‌সন্ ও ওয়েষ্টলেণ্ড সাহেব এবং অপরাপর উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা নবীনচন্দ্রের কার্য্যদক্ষতা সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। ওয়েষ্টলেণ্ড সাহেব ইহার কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া ইহাঁকে সবর্ডিনেট একাউণ্ট সার্ভিসে গ্রহণ করিয়াছিলেন। অবকাশকালে ইনি আফিসের কার্য্য সম্বন্ধীয় অনেক মন্তব্য লিখিতেন। নবীনচন্দ্র পাঠদশায় প্রভাকর, ভাস্কর প্রভৃতি সংবাদপত্রে মধ্যে মধ্যে বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিতেন। সন ১২৬৫ সালে প্রভাকরে "পদার্থ বিদ্যা অনুশীলনের ফল" এই প্রবন্ধটী লিখিয়া বেশ সুখ্যাতি পাইয়াছিলেন। নিমতলাঘাট ষ্ট্রীটস্থ ৺ভুবন চন্দ্র বসাকের "সংবাদ জ্ঞান রত্নাকর" পত্রিকায় প্রায় প্রবন্ধাদি লিখিতেন। সন ১২৬৪ সালে ইনি নিজে "কলিকাতা পত্রিকা" নামে একখানি মাসিকী প্রচার করেন। এই পত্রিকাতে অনেকগুলি নীতি-সন্দর্ভের মধ্যে "বাঙ্গালার অবস্থার একটী ধারাবাহিক প্রবন্ধ" প্রচারিত হয়। পত্রিকা খানি ১০।১২ সংখ্যার পর বন্ধ হইয়া যায়। ১২৬৮ সালে "শিল্প কল্পলতিকা" নামে একখানি মাসিকী প্রকাশিত হয়, তাহাতে কৃষি ও বিজ্ঞান বিষয়ে যে প্রবন্ধ লেখা আছে, তাহা ইহাঁরই রচিত। সন ১২৬৯ সালে কবিবর তারা চরণ দাস প্রণীত "মন্মথ কাব্য" ইনি সংশোধিত করিয়া দ্বিতীয় বার মুদ্রিত করেন। ঐ সালে কলিকাতা বাজারে বহু-প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী মান্যবর ব্রজগোপাল, নন্দগোপাল ও মতিলালদিগের দ্বারা "মনমোহন" নামে যে সপ্তাহিক সমাচার প্রচারিত হয়, ইনি তাহাতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন।

সন ১২৭৩ সালে "খগোল বিবরণ" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন।

বাঙ্গালা শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ ইহার ২০০ কাপি ক্রয় করেন। এই পুস্তক নরম্যাল বিদ্যালয়সমূহে পাঠ্য পুস্তক-রূপে পরিগণিত হয়। এই গ্রন্থ তখনকার প্রকাশিত প্রায় সমস্ত ইংরাজী ও বাঙ্গালা সংবাদপত্রে প্রশংসিত হইয়াছিল।

সন ১২৭৬ সালে "ব্যাবহারিক জ্যামিতি, ক্ষেত্র ব্যবহার, জরীপ ও সমস্থল প্রক্রিয়া" নামক গ্রন্থ সঙ্কলনপূর্ব্বক ইনি প্রকাশ করেন। এই পুস্তকখানি এ পর্য্যন্ত চারিবার মুদ্রিত হইয়াছে। বাঙ্গালা শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এই পুস্তকের ২০০ কাপি ক্রয় করিয়াছিলেন। এই পুস্তকের প্রথম ভাগে ইউক্লিড্-রচিত জ্যামিতি-শাস্ত্র মন্থন করিয়া সার সংকলন করিয়াছিলেন। ইহাতে ইহাঁর উদ্দেশ্য এই যে, বালকেরা অল্প সময়ের মধ্যে জ্যামিতিঘটিত স্থূল স্থূল তত্ত্ব শিক্ষা করিবে, আর ইহার দ্বারা জ্যামিতি-শাস্ত্রের আলোচনা, সুসাধ্য হইয়া আসিবে, গণিতের প্রধান প্রধান শাখা অনায়াসে আয়ত্ত হইবে, এবং অল্প সময়ের মধ্যে অধিক বিদ্যা উপার্জ্জন হইবে। এই গ্রন্থ সম্বন্ধে স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সোমপ্রকাশ-সম্পাদক মহাশয় তাঁহার সন ১২৭৬ সালে ২২ এ ভাদ্রের পত্রে এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—"শ্রীযুক্ত বাবু নবীনচন্দ্র দত্ত ইতিপূর্ব্বে খগোল বিবরণ নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ, বিজ্ঞান-শাস্ত্রে অধিকার এবং বিশুদ্ধ অথচ সরল রচনা-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। বর্ত্তমান গ্রন্থ দ্বারা তাঁহার সেই সকল গুণের অধিকতর পরিচয় হইতেছে।" তৎপরে এডুকেশন গেজেট-সম্পাদক এই গ্রন্থ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন—"খগোল বিবরণ ও ব্যাবহারিক জ্যামিতিতে নবীন বাবু বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় গ্রন্থরচনায় বিশিষ্ট ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন। প্রোফেসর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জ্যামিতি অনুবাদ করিয়া যেরূপ ভাষা প্রচলন করিয়াছিলেন, তাহা অপেক্ষা এই জ্যামিতির ভাষা সরল, প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ।"

১২৭৯ সালে "সংগীত রত্নাকর" নামে একখানি বৃহৎ সংগীত-গ্রন্থ ইনি প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে বৈজ্ঞানিক প্রণালী-ক্রমে সংগীতের যাবতীয় মূলসূত্র ও স্বর-সাধন এবং সেতার, মৃদঙ্গ ও তবলা সাধন-প্রণালী বিবৃত হইয়াছে। অপর বিস্তর রাগের গৎ ও কতিপয় রাগের তেলেনা ও সাধারণ প্রচলিত কতিপয় সেতারের গৎ ও গীত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইং ১৮৭৩ সালের ১৭ই মে তারিখে বিদ্যালয়সমূহের ডিরেক্টর সার্টক্লীফ্ সাহেব এই পুস্তকের একটী সমালোচনা প্রকাশ করেন।

সন ১২৮০ সালে "সাহিত্য মঞ্জরী" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। সময়ে সময়ে নবীন বাবুর যে সকল পদ্য প্রবন্ধ পত্রিকাতে প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কয়েকটী প্রবন্ধ নির্ব্বাচন করিয়া ও দুই একটী প্রবন্ধ অন্যত্র হইতে

উদ্ধৃত করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। পদ্য প্রবন্ধগুলি প্রায় সঙ্কলিত, কয়েকটী তিনি নিজেও লিখিয়াছিলেন। এই গ্রন্থ অনেক গণনীয় বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

সন ১২৮৩ সালে নবীন বাবু "গীত সার-সংগ্রহ" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত করেন। ইহাতে তাঁহার নিজের রচিত অনেকগুলি গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে।

সন ১২৪৩ সালের ২০শে আশ্বিন মঙ্গলবার, অসিত পক্ষ, দশমী তিথি, মকরলগ্নে, নবীন বাবুর জন্ম হয়। ইঁহার কোষ্ঠীতে ইনি বহুবিদ্যা ও গুণবিশিষ্ট হইবেন বলিয়া বর্ণনা ছিল এবং কোষ্ঠীর লেখা মত ইনি শাস্ত্রজ্ঞ, পণ্ডিত, বুদ্ধিমান্, বন্ধুর উপকারক, ধর্ম্মশীল, সাহসী, বিদ্যাস্মরণধারক হইয়াছিলেন।

সন ১২৭৯।৮০ সালে ঝামাপুকুর হইতে "দূত" নামে যে সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়, তাহাতেও নবীন বাবু লিখিতেন। "ধাতু ও ইহার উৎপত্তি-প্রণালী" এই বিষয়ে একটী ধারাবাহিক প্রবন্ধ তিনি এই পত্রিকাতে লিখিয়াছিলেন।

১২৮০ সালে নবীন বাবু স্কুলবুক সোসাইটীর আদেশমতে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক স্মট্ সাহেবের "নোটস্ অন্ প্রাক্টিকেল জিওমেট্রি" এবং "নোটস্ অন্ সারভেয়িং", এই পুস্তকদ্বয়ের বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন।

১২৮১ সালে "হেমলতা" নামে যে একখানি পাক্ষিক পত্র ও সমালোচনা প্রকাশিত হয়, তাহাতে নবীন বাবু "ওট্রেণ্টো দুর্গ" এই বিষয়টী ইংরাজী হইতে অনুবাদিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সন ১২৮১ সালে কলিকাতা, মালদহ প্রভৃতি প্রদেশের বারেন্দ্রকুল তন্তুবায়সমূহ যাহাতে একশ্রেণীবদ্ধ হন তদ্বিষয়ে, ও তাঁহাদিগের পরস্পর আহার, ব্যবহার এবং বিবাহাদি প্রচলন বিষয়ে নবীন বাবু একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। নবীন বাবু উদ্যোগী হইয়া নীলকমল বসাক, ৺রাধানাথ বসাক B. A., আনন্দনাথ বসাক ও ৺তারিণীচরণ দত্তের সাহায্যে কলিকাতা, মালদহ, গোবরডাঙ্গা, হুগলী, প্রভৃতি স্থানে স্বজাতীয়দিগের সহিত আদান প্রদান প্রচলিত করিবার, বিবাহঘটিত ব্যয় অনেক সংক্ষেপ করিবার ও বিবাহকার্য্যের অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

১২৮২ সালে স্কুল বুক সোসাইটীর আদেশ মতে "Hints to Ameens on Khusrah Surveys in Bengal" এই পুস্তকের অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন। এই তিনখানি পুস্তক প্রাইমারি পাঠশালায় পাঠ্যপুস্তকমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল।

১২৮২ সালে নবীন বাবু "সচিত্র বর্ণ বিবোধ", ১ম ভাগ প্রকাশ করেন। ঐ সালে "মহাজনী দর্শন ও সোজা ও শুভঙ্করী জমা খরচী হিসাব অনুসারে জমীদারী ও বাজার হিসাব" নামে একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। সোজা ভকরারী জমা খরচ শিক্ষার বাঙ্গালায় এইখানিই প্রথম

পুস্তক। পুস্তকখানি বালক, বিশেষতঃ বিষয়ী লোকদিগের বড় উপকারী।

নবীন বাবু "বামাবোধিনী পত্রিকায় ৩৬ বৎসর কাল নিয়মিতরূপে লিখিয়াছিলেন। বামাবোধিনী পত্রিকার জন্ম অবধি তিনি এই পত্রে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে হিন্দু বিবাহপ্রণালী, বারিবিজ্ঞান, শব্দবিজ্ঞান, ভূমির সার, সৃষ্টিপ্রক্রিয়া-রহস্য, পাঁচন ও মুষ্টিযোগ, বারনপ্রণালী, স্বরসাধনপ্রণালী, গোপরিচর্য্যা, রত্ন, হেঁয়ালী, হারমোনিয়ম, ও বিবিধ সাময়িক প্রবন্ধ এইগুলিই প্রধান।

এতদ্ভিন্ন তিনি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের "সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়"; দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের "সোমপ্রকাশ"; যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের "সাপ্তাহিক সমাচার" প্রাণনাথ দত্ত রায় চৌধুরীর "রহস্য সন্দর্ভ"; এবং কেশবচন্দ্র সেনের "ধর্ম্মতত্ত্ব" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাতেও অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

নবীন বাবু ৫৯ বৎসর বয়সেও পরিশ্রম-পরাঙ্মুখ ছিলেন না। তিনি এত অধিক বয়সে পীড়াগ্রস্ত হইয়াও "নিধু বাবুর গীতাবলীর সংশোধিত ভূমিকা", "নিত্য কর্ম্ম পদ্ধতি", "হারমোনিয়ম সূত্র" প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া ১২৭নং মস্‌জিদবাড়ী ষ্ট্রীটস্থ বসাক এণ্ড সনস্ দ্বারা প্রকাশিত করেন। এতদ্ভিন্ন "শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতা" লিখিয়া যান; ইহাই তাঁহার জীবনের শেষ কার্য্য। ইহাতে বিস্তীর্ণ উপক্রমণিকা, প্রথম অধ্যায়ের আদিতে সংক্ষিপ্ত বিরণ, মূল, স্বামীর টীকা, অন্বয়, দুরূহ শব্দের অর্থ, মূলের বিস্তীর্ণ ব্যাখ্যা, বাঙ্গালা পদ্যে ও ইংরাজীতে অনুবাদ, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, গীতা-মাহাত্ম্য বাঙ্গালায় অনুবাদ, হিন্দু যোগশাস্ত্র প্রভৃতি লিখিয়াছেন। এই পুস্তকখানি এখন যন্ত্রস্থ। আরও "সংগীত সোপান" নামে একখানি বৃহৎ সংগীত পুস্তক ২০।২২ বৎসর ধরিয়া লিখিয়া রাখিয়াছেন। ইহাতে সঙ্গীতের বিবিধ বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রথমতঃ সংগীতশিক্ষা বিষয়ক তাল, মাত্রা, অলঙ্কারাদি জ্ঞাতব্য বিষয়; ২য় ভাগে স্বরাধ্যায়; ৩য় ভাগে রাগাধ্যায়; ৪র্থ ভাগে যন্ত্রাধ্যায়; ৫ম ভাগে কণ্ঠ সংগীত; ৬ষ্ঠ ভাগে তালানার ছন্দ; ৭ম ভাগে গতাধ্যায়; ৮ম ভাগে গীতাধ্যায়; ৯ম ভাগে বৈদেশিক স্বর-বিন্যাস এবং এতৎ-সম্বন্ধে বিস্তর বৈজ্ঞানিক তর্ক ও যুক্তির মীমাংসা করিয়া গিয়াছেন। সন ১২৬২ সালে বাগবাজারের স্বর্গীয় বিধুবদন দত্তের দ্বিতীয় কন্যা স্বর্গীয় কাদম্বিনী দাসীর সহিত নবীন বাবুর বিবাহ হয়। ইঁহাদের ৩টী পুত্র ও দুইটী কন্যা হয়। ১২৭৮ সালে নবীন বাবুর ৩৫ বৎসর বয়সের সময় পত্নীবিয়োগ হয়। তিনি আর দ্বিতীয় দার-পরিগ্রহ করেন নাই। তদবধি সু-দীর্ঘকাল শুদ্ধাচারী ও ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বী হইয়া শাস্ত্রচর্চ্চায় ও কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে জীবন যাপন করিয়াছেন। ইহা সামান্য সাধুদৃষ্টান্ত নহে।

সন ১৩০৫ সালের ৮ই পৌষ বৃহস্পতি-বার, রজনী ২।৩টার সময়ে সকল সন্তানকে রাখিয়া নবীন বাবু স্বর্গলাভ করিয়াছেন।

রাসায়নিক পদার্থ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

অজোন বা গন্ধাম্লজান।

(OZONE).

চিহ্ন ০৩ ; সাংযোগিক গুরুত্ব ৪৮।

অজোন অম্লজানের রূপান্তর মাত্র।

ধর্ম্ম—১। অম্লজানের মধ্যে উপর্য্যুপরি বিদ্যুৎ পরিচালিত করিলে এক প্রকার গন্ধবিশিষ্ট 'অজোন'নামক পদার্থের উৎপত্তি হয়। ইহা অক্সিজেন অপেক্ষা ১॥০ দেড় গুণ ভারী ও হাইড্রজেন অপেক্ষা ২৪ গুণ ভারী। অম্লজান অপেক্ষা অজোনের রাসায়নিক শক্তি অধিকতর প্রবল। অম্লজান অজোনে পরিণত হইলে উহার আয়তনের হ্রাস হয় ও গুণের বৃদ্ধি হয় অর্থাৎ দেড় আয়তন অম্লজান ১ আয়তন অজোনে পরিণত হয়। অম্লজানও জলে পরিণত হইলে উহার আয়তনের হ্রাস ও গুণের বৃদ্ধি হয়। কোন ধাতুর সহিত অম্লজান সংযুক্ত হয় না, কিন্তু অজোন সহজেই সংযুক্ত হইয়া থাকে। অজোনের বর্ণনাশকতা শক্তি অতি প্রবল।

২। অজোন জলে কিম্বা এসিডে দ্রব হয় না। অজোন ২৮৮ ডিগ্রী তাপে পুনরায় অম্লজানে পরিণত হয়।

৩। জলকে তাড়িতদ্বারা বিশ্লিষ্ট করিবার সময় যে গন্ধ উৎপন্ন হয়, উহা অজোনের গন্ধ; কারণ ঐ সময় কিয়ৎ পরিমাণে অম্লজান অজোনে পরিণত হয়।

৪। অজোনের গন্ধ অল্প—ক্লোরাইন বা নাইট্রিক এসিডের ন্যায়। ইহা সহজেই দুর্গন্ধ হরণ করে। কেহ কেহ বলেন, বায়ুমণ্ডলে অজোন মিশ্রিত হইলে জ্বর ও ওলাউঠা প্রভৃতি সংক্রামক রোগ জন্মে; কিন্তু অজোন স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রধান উপকারী, এ কথা সকলেই বলিয়া থাকেন।

প্রস্তুতপ্রণালী—১। কোন অম্লজানপূর্ণ বোতলের মুখে কার্কছিদ্র দিয়া দুইটী বিদ্যুতের তার উক্ত বোতলমধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া কিয়ৎক্ষণ বিদ্যুৎ পরিচালিত করিলে অজোন প্রস্তুত হয়।

২। কোন পাত্রে কিয়ৎপরিমাণ জল রাখিয়া, এক খণ্ড ফসফরসের কিয়ৎভাগ জলে নিমগ্ন করিলে বায়ুস্থিত অম্লজান অজোনে পরিণত হয়।

৩। একটী পাত্রে কিঞ্চিৎ সলফিউরিক ইথার রাখিয়া তদুপরি তপ্ত লৌহ রাখিলে অজোন উৎপন্ন হয়।

৪। বিদ্যুৎ হইবার সময়ে বায়ুরাশিতে অজোন জন্মে।

পরীক্ষা—কিছু ময়দা জলে গুলিয়া উহাতে কিঞ্চিৎ আইয়োডাইড অব্ পটাশ মিশ্রিত করতঃ উক্ত দ্রব্য একখণ্ড ব্লটিং কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় মাখাইলে অজোন-

কাগজ প্রস্তুত হয়। ইহা অম্লজানপূর্ণ বোতল মধ্যে নিমগ্ন করিলে উক্ত কাগজ তৎক্ষণাৎ নীলবর্ণ হইবে। ইহার কারণ, অজোন, পটাসিয়ম আইয়োডাইড্ হইতে কিয়ৎ পরিমাণে আইয়োডাইড্ বাহির করিয়া দেওয়াতে, আইয়োডাইন্ ময়দার সহিত মিশ্রিত হইয়া, একপ্রকার নীলবর্ণ পদার্থ উৎপন্ন করে। এণ্টজোন (Antzone) আর এক প্রকার অজোনের রূপান্তর মাত্র।

হাইড্রোজেন বা উদজান।

HYDROGEN.

সাঙ্কেতিক নাম H; পরমাণুর ভার—১।

ইতিহাস—১৬০০ অব্দে ডাং প্যারাসেল্সস্ (Paracelsus) হাইড্রোজেনের বিষয় প্রথম উল্লেখ করেন। তিনি স্থির করেন যে, যখন লৌহ সালফিউরিক এসিডে দ্রব হয়, তখন হাইড্রোজেন বাষ্প উৎপন্ন হইয়া থাকে। তৎপরে ১৭৭৬ অব্দে ডাক্তার ক্যাভেণ্ডিস্ প্রমাণ দ্বারা স্থির করেন যে, ইহা দাহ্য। ১৭৮১ অব্দে ইনি নির্ণয় করেন যে, এই পদার্থটী দহন সময়ে অম্লজানের সহিত মিলিত হইয়া জল উৎপন্ন করে। হাইড্রস (Hydros) অর্থে জল ও জেনিরো (Genero) অর্থে প্রস্তুত করি; এজন্য লেবোসিয়র (Lavosier) সাহেব ভাষায় ইহার নাম হাইড্রোজেন বা উদজান দেন। যখন ইহা ভূবায়ুতে দগ্ধ হয়, তখন বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া জল উৎপন্ন করে। শতাংশিকের ০ অংশ উষ্ণতায় ৭৬০ মিলিমিটর চাপে ১১·১৯ লিটর হাইড্রোজেনের ভার ১ গ্রাম।

অবস্থা—অসংযুক্ত অবস্থায় ইহা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কেবল কোন কোন উল্কালৌহে আগ্নেয় গৈরিক গ্যাসবিশেষে সূর্য্য ও নক্ষত্রমণ্ডলে অবস্থিতি করে। সংযুক্ত অবস্থায় জলরাশির গুরুত্বের ১/৯ অংশ নানা প্রকার এসিডে, তৈলে, এমোনিয়া প্রভৃতি পদার্থে আছে।

ধর্ম্ম—হাইড্রোজেন বর্ণ-গন্ধ-স্বাদহীন স্বচ্ছ অদৃশ্য বায়বীয় পদার্থ। ইহা বায়ু অপেক্ষা অত্যন্ত লঘু। বায়ুর ভার ১ ধরিলে ইহার ভার ·০৬৯২ ধরা যায়। ইহার ন্যায় লঘু পদার্থ পৃথিবীতে আর নাই। এই সমায়তন গুরুত্বকে ১ ধরিলে যাবতীয় মূল পদার্থের সাংযোগিক, আণবিক ও পারমাণিক ভার নির্ণীত হইতে পারে। অম্লজানের ন্যায় উদজান দাহক নহে, দাহ্য পদার্থ। জ্বলন্ত দীপশলাকা হাইড্রোজেনপূর্ণ বোতলমধ্যে নিক্ষেপ করিলে নিবিয়া যায়; কিন্ত

মুখের গোড়ায় ধরিলে বাহিরের বায়ু সংযোগে অনুজ্জ্বল নীলবর্ণ হইয়া জ্বলিতে থাকে। ইহার শিখা নীলবর্ণ বটে, কিন্তু ইহার তাপ এত অধিক যে, ১ কিলগ্রাম হাইড্রোজেন ও ৮ কিলগ্রাম অক্সিজেন সংযোগে যে তাপ হয়, তদ্দ্বারা ৩৪৪৬২ কিলগ্রাম জলের উষ্ণতা ১ শতাংশিক বৃদ্ধি পায়। হাইড্রোজেন বায়ুস্থিত অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া জল উৎপন্ন করে। হাইড্রোজেন সংযুক্ত দ্রব্যকে হাইড্রেড বা উদ্জানিত এবং হাইড্রোজেন বিহীন দ্রব্যকে এসিডরাইড্ কহে।

সংগ্রহপ্রণালী—১। জলে কয়েক ফোঁটা অম্ল মিশ্রিত করিয়া উপর্য্যুপরি বিদ্যুতের স্রোত চালাইলে দস্তালয় তার দিয়া যে পরিমাণে হাইড্রোজেন বহির্গত হইবে, প্লাটিনমসংযুক্ত তার দিয়া তাহার অর্দ্ধেক আয়তন অম্লজান বহির্গত হইবে। যথা—$২H_{২}O = O_{২} + ২H_{২}$

২। জলের উপাদান বলিয়া, প্রধানতঃ জল হইতেই হাইড্রোজেন প্রস্তুত হয়। জলে পটাশিয়ম নিক্ষেপ করিলে, অন্যূন অর্দ্ধেক হাইড্রোজেন বহির্গত হয়। কিন্তু এত তাপ জন্মে যে, সমস্ত হাইড্রোজেন দগ্ধ হইয়া পাটাসিয়ম ও জলস্থ অম্লজান সংযুক্ত হইয়া পটাশিয়ম হাইড্রোমনক্সাইড অথবা কষ্টিক পটাস প্রস্তুত হয়। যথা—$২H_{২}O + K_{২} = ২KHO + H_{২}$

৩। সচরাচর শীতল জলে সোডিয়ম নিক্ষেপ করিলে হাইড্রোজেন প্রস্তুত হয়। উষ্ণজলে সোডিয়ম নিক্ষেপ করিলে হাইড্রোজেন বহির্গত হইয়া যায়, ইহাতে অধিকক্ষণ পূর্ব্বের ন্যায় রাসায়নিক সংযোগ হয়, এবং পাত্র মধ্যে সোডিয়ম হাইড্রাক্সাইড্ প্রস্তুত হয়। যথা—$২H_{২}O + Na_{২} = ২NaHO + H_{২}$।

৪। উত্তপ্ত লৌহ-চূর্ণ-পরিপূর্ণ নলের মধ্য দিয়া জলীয় বাষ্পের স্রোত চালাইলে হাইড্রোজেন বহির্গত হয়, জলের অম্লজান লৌহের সহিত সংযুক্ত হইয়া ফেরম্ অক্সাইড উৎপন্ন করে। যথা $Fe_{৩} + ৪H_{২}O = Fe_{৩}O_{৪} + ৪H_{২}$।

৫। সচারাচর দস্তাটুকরার উপর জল মিশ্রিত সলফিউরিক এসিড্ ঢালিলে হাইড্রোজেন বিমুক্ত হয় এবং জিঙ্কসলফেট ($ZNSO_{৪}$) বোতলমধ্যে থাকিয়া যায়। যথা—$ZN + H_{২}SO_{৪} = ZNSO_{৪} + H_{২}$।

৬। উক্ত প্রকার সলফিউরিক এসিড লৌহ-চূর্ণের উপর ঢালিলে হাইড্রোজেন বহির্গত হয়, কিন্তু অল্প তাপ সংযোগ করিলে শীঘ্র শীঘ্র হাইড্রোজেন বহির্গত হয়, বোতলের মধ্যে ফেরিক সলফিউরস বা হীরাকস জন্মে। যথা—$Fe + H_{২}SO_{৪} = FeSO_{৪} + H_{২}$।

পরীক্ষা—১। হাইড্রোজেন-পূর্ণ বোতলমধ্যে অলন্ত বাতি প্রবিষ্ট করিয়া দিলে নিবিয়া যায়, কিন্তু বহির্বায়ুর সংযোগে অনুজ্জ্বল নীলবর্ণ শিখায় জ্বলিতে থাকে।

২। উক্ত অনুজ্জ্বল শিখার উপর কোন প্রকাণ্ড পাত্র ধরিলে উহাতে শিশিরকণা সদৃশ জলবিন্দু সকল বিন্যস্ত হইবে;

কারণ হাইড্রোজেন দগ্ধ হইবার সময় বায়ুস্থ অম্লজানের সহিত সংযুক্ত হইয়া জল উৎপন্ন করে।

৩। একটী হাইড্রোজেনপূর্ণ বোতলের কার্কে একটী ছিদ্র করিয়া উহাতে একটী কাচ-নল প্রবিষ্ট করিয়া দাও, পরে উক্ত নলের উপর একটি জ্বলন্ত দীপ ধরিলে হাইড্রোজেন বাষ্প অনুজ্জ্বল শিখায় জ্বলিতে থাকে, তখন উহার উপর একটী সুদীর্ঘ কাচ-নলী ধরিলে সুমধুর বাদ্যধ্বনি সদৃশ শব্দ হইবে।

৪। একটী সোডাওয়াটারের বোতলে দুই আয়তন হাইড্রোজেন ও এক আয়তন অক্সিজেন একত্র করিয়া বিদ্যুৎ-চালিত দীপ স্পর্শ করিলে কামানের শব্দের ন্যায় শব্দ উৎপাদন করতঃ জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়।

৫। একটী রবরের বাঁশী উদজান দ্বারা পূর্ণ করিয়া উত্তমরূপে মুখ বন্ধ করিয়া ছাড়িয়া দিলে বাঁশীটী উপরে উঠিতে থাকিবে। এই নিমিত্ত পূর্ব্বে ব্যোমযান উড়াইবার জন্য উদজান ব্যবহৃত হইত। কিন্তু উদজান সংগ্রহ ক্লেশকর বলিয়া এক্ষণে কোলগ্যাস ব্যবহৃত হয়।

গার্হস্থ্য প্রবন্ধ।

(৪০৫-৬ সংখ্যা—২৩৪ পৃষ্ঠার পর)

পিতা মাতাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি করা, ভ্রাতা ভগিনীগুলিকে প্রীতির চক্ষে দেখা ও ভালবাসা তত কষ্টসাধ্য ব্যাপার নহে। ইহাদিগের প্রতি কর্ত্তব্যসাধন দ্বারা আমাদিগের বিশেষ কোনরূপ মহত্ব প্রকাশ পায় না। যাঁহারা এত কষ্টে ও যত্নে লালন পালন করিয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও ভক্তি স্বাভাবিক। যাহাদিগের সঙ্গে শৈশবাবধি একত্র আহার বিহার করিয়াছি, মায়ের স্তন লইয়া কাড়াকাড়ী করিয়াছি, খেলনা লইয়া ঝগড়া করিয়াছি, খাবার দ্রব্য লইয়া কাঁদাকাঁদি করিয়াছি, তাহাদিগের প্রতি অনুরাগ এবং স্নেহ ইহাও নৈসর্গিক। কিন্তু যাঁহাদিগের সহিত অধিক দিন বাস করি নাই, যাঁহাদিগের সঙ্গে পূর্ব্বে কোনরূপ পরিচয় ছিল না, তাঁহাদিগকে আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি করা ও প্রাণ দিয়া ভালবাসা মহত্ত্বের কার্য্য। পরমার্চ্চনীয় শ্বশুর এবং শ্বশ্রূকে পিতৃমাতৃস্থানীয় করিয়া তদ্রূপ শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে সর্ব্বদা তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা করা আমাদিগের একটী শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য। 'ভক্তি-সাধনা কর্ত্তব্যের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। ভক্তি ব্যতিরেকে পুণ্য, নীতি এবং সর্ব্বাঙ্গীণ কর্ত্তব্য সাধন কদাচ হইতে পারে না। জনক, জননী, শ্বশুর, শ্বশ্রূ প্রভৃতি অর্চ্চনীয়াদিগের প্রতি ভক্তিমতী হইতে না পারিলে, পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি ভক্তিপরায়ণা হওয়া

কখনই সম্ভব নয়। ইহাঁদিগের প্রতি ভক্তিমতী হইলে ইহাঁদিগের আনুগত্য ও বাধ্যতা স্বীকার করা স্বাভাবিক। আমরা যদি প্রত্যক্ষ দেবতাস্বরূপ পিতা, মাতা, শ্বশুর ও শ্বশ্রূকে প্রীতি করিতে না পারি, তবে পরম পিতা পরমেশ্বরকে ও অপরাপর পরিবারবর্গকে যে প্রীতি করিব এ আশা ও ইচ্ছা সম্পূর্ণ অমূলক। এই মহদ্‌ব্রতটী যদি আমাদিগের জীবনে অসম্পন্ন থাকে, তবে আমরা সুখ, শান্তি লাভে সমর্থ হইব না। ইহার জন্য একদিন আমাদিগকে নিশ্চয়ই অনুতপ্ত হইতে হইবে। গুরুর গুরু পরম গুরু পিতা পরমেশ্বরে ভক্তি রাখিয়া এই মহদ্‌ব্রত সাধনে জীবন উৎসর্গ করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

চরিত্রবতী হওয়া সর্ব্বোপরি প্রয়োজন। চরিত্রই মনুষ্যের সুখ ও দুঃখের এক মাত্র হেতু। চরিত্র সৎ হইলে সুখ অনিবার্য্য। নিজের সচ্চরিত্র দ্বারা যে কেবল নিজেই সুখ শান্তি উপভোগ করা যায় তাহা নয়, পরিবারের সকলে এবং প্রতিবেশিগণও ইহার অংশভাগী হন। যাঁহারা ভাবী বংশধরগণের জননী, যাঁহারা গৃহের লক্ষ্মীস্বরূপা, তাঁহারা চরিত্রবতী না হইলে সুখের প্রত্যাশা করা "শূন্যে দুর্গ নির্ম্মাণ" ব্যতীত আর কিছুই নয়।

সমদর্শিতা চরিত্রের একটী উপাদান। হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা সমূলে বর্জ্জন করিতে হইবে। সকলকে সমদৃষ্টিতে দেখিতে হইবে ও প্রাণ দিয়া সকলকে ভালবাসিতে হইবে। স্বার্থের আধিক্য বা ন্যূনতা প্রযুক্ত কাহাকেও কম বা কাহাকেও অধিক প্রীতির চক্ষে দেখিলে চলিবে না। উদার-প্রকৃতি-বিশিষ্ট না হইলে সুখ শান্তি লাভ অসম্ভব।

আত্মত্যাগ বিশেষ প্রয়োজনীয়। সর্ব্বপ্রকার স্বার্থসুখ পরসুখে ও পরার্থে বিসর্জ্জন করিতে হইবে। সদ্‌ব্যবহার দ্বারা গৃহের লক্ষ্মী ও শ্রীস্বরূপা হইতে হইবে।

যিনি বিনীত, পৃথিবী তাঁহার নিকট পরাজিত, অতএব সর্ব্বাপেক্ষা বিনয়ী হওয়া কর্ত্তব্য।

আপাততঃ কষ্ট, যন্ত্রণা ও বিপদ দর্শনে পলায়মান না হইয়া সম্মুখীন হইবার ক্ষমতার নাম ধৈর্য্য। ধৈর্য্যগুণ অভ্যাস করিতে যত্নশীল হওয়া কর্ত্তব্য। কোন অপ্রতিবিধেয় বিপদে পতিত হইলে ধৈর্য্যই আমাদিগের বর্ম্মস্বরূপ হইয়া আমাদিগকে শান্ত চিত্তে রাখিতে সমর্থ হয়।

মিতাচারিতা দ্বারা আমরা সকল অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হইবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হই। মিতাচারী হওয়া অতীব আবশ্যক।

দয়া চরিত্রের একটী অপর উপাদান। দয়া ব্যতীত মানব-হৃদয় সংসার-পিশাচ-গণের বাসস্থান হইয়া পড়ে। দয়া জীবের প্রধান ধর্ম্ম। দয়াবান্ যখন পরের দুঃখে দুঃখিত হইয়া, দুঃখ বিমোচনে যত্নশীল হন, তখন জগৎ হইতে দরিদ্রতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া যায়। তিনি

অপরের উপকার করিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করেন এবং উপকৃত ব্যক্তি স্বীয় অভাব মোচনের জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইয়া থাকে।

সর্ব্বজন সমক্ষে ও অগোচরে একই প্রকার কার্য্য করিবার ক্ষমতা লাভ করিতে হইলেই সত্যপ্রিয় হইতে হইবে। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই সত্য সর্ব্বপ্রধান বলিয়া নির্দ্দেশিত রহিয়াছে। সত্যপ্রিয়তা ন্যায়পরায়ণতার সহিত সংযুক্ত হইলে প্রকৃত চরিত্র গঠিত হইয়া থাকে। যিনি ন্যায়বান্, তিনি কখনও কাহাকেও ন্যায্য বিষয় হইতে বঞ্চিত করেন না। বিপদই হউক অথবা কোন স্বার্থের অনিষ্ট সংঘটনই হউক, ন্যায়বান্ কথনই নীতির আদেশ পালন করিতে কুণ্ঠিত হন না।

পদমর্য্যাদা অনুসারে কার্য্য করিবার ক্ষমতা চরিত্রের অপর একটি উপাদান। পিতার পুত্রের সহিত ও মাতার কন্যার সহিত সমবয়সী ভাব মর্য্যাদার হানিকর। প্রভু যদি সর্ব্বদা ভৃত্যকে লইয়া উপহাস করেন, অথবা দাস দাসীর প্রতি কু-অভিসন্ধি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে এক দিন তাঁহাকে দাস দাসীর নিকট অপদস্থ হইতে হইবে সন্দেহ নাই। গুরুজনকে লোকে ভক্তি করে এবং ভয়ও করে, গুরুজনের প্রতি সেই ভয় বজায় রাখিয়া চলা কর্ত্তব্য।

লজ্জা স্ত্রীচরিত্রের উৎকৃষ্ট ভূষণ। লজ্জা কি তাহা সম্পূর্ণরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া, বৈধ লজ্জার বশবর্ত্তী হওয়া প্রয়োজন।

সর্ব্ববিধ আলস্য, কপটতা, পরনিন্দা ও ঈর্ষা ঐকান্তিক যত্নের সহিত পরিত্যাগ করিতে হইবে।

সাম্য ব্যতীত কোন জাতিই সিংহ-প্রতিম স্বত্ব লাভে সমর্থ হয় নাই। তদ্রূপ ধর্ম্ম, নীতি ও একতা ভিন্ন পারিবারিক জীবন অঙ্গহীন। পারিবারিক উন্নতি ধর্ম্ম, নীতি এবং একতার উপর দণ্ডায়মান। পৃথিবীতে একতা দ্বারাই যাবতীয় মঙ্গল সংসাধিত হইতেছে। যে দেশে ও যে পরিবারে একতা, সেই দেশ ও সেই পরিবার সুখসমৃদ্ধিশালী। যে পরিবারে একতার অভাব, সে পরিবারে কলহ বিবাদে শান্তিপ্রবাহ অবরুদ্ধ হইয়া অশেষ অমঙ্গল উৎপাদন করে। পরিবারকে সমুন্নত করিতে হইলে একতাই আমাদিগের অবলম্বনীয়।

পরিবারের প্রত্যেকের প্রতিই সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। পরিবারস্থ বিধবাদিগের প্রতি অতিশয় সতর্কতা অবলম্বন পূর্ব্বক ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। বিশেষ যত্ন-সহকারে ইহাদিগের আহারের বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া উচিত।

(ক্রমশঃ)

প্রেমের গৌরাঙ্গ।

(৪০৭ সংখ্যা ২৯১ পৃষ্ঠার পর)

প্রভু যে গ্রাম দিয়া একবার মাত্র গমন করিয়াছেন, সে গ্রামের লোক আত্মহারা হইয়া তচ্চরণে বিলুণ্ঠিত হইয়াছে। প্রভু শ্রীনাম সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে পথে চলিয়াছেন, পথিমধ্যে মনুষ্য দেখিলে হরি নাম করিতে উপদেশ দিতেছেন, আর সেই লোক অমনি আনন্দে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া হরিনাম করিতেছে, আর প্রভুর সঙ্গ ছাড়িতে পারিতেছে না; যথা—

"সেই লোক প্রেমে মত্ত বলে হরিকৃষ্ণ।
প্রভুর পাছে সঙ্গে যায় দর্শন-সতৃষ্ণ॥" চৈঃ চঃ

কেবল মাত্র এক স্থলে যে এই ঘটনা ঘটিল তাহা নহে, প্রতি দেশে, প্রতি গ্রামে, প্রতি মনুষ্যের সম্বন্ধেই এইরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে।

"এইমত পথে যাইতে শত শত জন,
বৈষ্ণব করেন তাঁরে দিয়া আলিঙ্গন॥
যেই গ্রামে রহি ভিক্ষা করেন যার ঘরে।
সেই গ্রামের যত লোক আইসে দেখি-
বারে।
প্রভুর কৃপায় হয় মহা ভাগবত।
সে সবে আচার্য্য হয়ে তারিলা জগৎ॥
এইমত কৈলা যাবৎ গেলা সেতুবন্ধে।
সর্ব্বদেশ বৈষ্ণব হইল প্রভুর সমন্ধে।"
চৈঃ চঃ।

প্রেমের দেবতা শ্রীগৌরাঙ্গ ব্যতীত আর কাহার দর্শনে মুহূর্ত্ত মাত্রে লক্ষ লক্ষ জীবের এমন মহান্ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে? এই সময় কূর্ম্ম নামক এক বৈদিক ব্রাহ্মণ শ্রীপ্রভুর দর্শনলাভে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ-পূর্ব্বক পরম প্রীতি সহকারে তাঁহার সেবা করিলেন। প্রভুর বিদায়কাল সমাগত দৃষ্টে কূর্ম্ম ব্যাকুলচিত্ত হইয়া পড়িলেন, আর তিল মাত্র প্রভুর সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহে বাস করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। তিনি প্রভুর সঙ্গে গমনেচ্ছা জানাইলে,

"প্রভু কহে ঐছে বাত কভু না বলিবা।
গৃহে রহি নিরন্তর কৃষ্ণনাম লৈবা॥" চৈঃচঃ।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমের পূর্ণ উৎস। সে তরঙ্গে যে একবার ডুবিয়াছে, তাই তচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া আত্ম-কৃতার্থতা লাভ করিয়াছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমোন্মত্ত অবস্থা দৃষ্টে সিদ্ধ বটেশ্বরে তীর্থরাম নামক এক ধনী ব্যক্তি তাঁহাকে পরীক্ষা করিতে গিয়া স্বয়ং হৃতসর্ব্বস্ব অর্থাৎ আত্মহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। যথা,—

"হেন কালে আইলা সেথা তীর্থ ধনবান্।
দুই জন বেশ্যা সঙ্গে আইলা দেখিতে।
চৈতন্যের ভারি ভুরি পরীক্ষা করিতে॥
সত্যবাই লক্ষীবাই নামে বেশ্যাদ্বয়।
প্রভুর নিকটে বসি কত কথা কয়॥

ধনীর শিক্ষায় সেই বেশ্যা দুইজন।
প্রভুরে বুঝিতে করে বহু আয়োজন॥
তীর্থরাম মনে মনে নানা কথা বলে।
সন্ন্যাসীর তেজ এবে হরে লব ছলে॥
কত রঙ্গ করে লক্ষ্মী সত্যবালা হাসে।
সত্যবালা হাসিমুখে বসে প্রভু পাশে॥
কাঁচলী খুলিয়া সত্য দেখাইলা *।
সত্যরে করিলা প্রভু মাতৃ-সম্বোধন॥
থর থর কাঁপে সত্য প্রভুর বচনে।
ইহা দেখি লক্ষ্মী বড় ভয় পায় মনে।
কিছুই বিকার নাই প্রভুর মনেতে।
ধেয়ে গিয়া সত্যবালা পড়ে চরণেতে॥
কেন অপরাধী কর আমারে জননী।
এই মাত্র বলি প্রভু পড়িলা ধরণী॥
সব এলো থেলো হ'ল প্রভুর আমার।
কোথা লক্ষ্মী কোথা সত্য নাহি দেখি আর॥
নাচিতে লাগিলা প্রভু বলি হরি হরি।
লোমাঞ্চিত কলেবর অশ্রু দর দরি॥

* * *

হরিনামে মত্ত হ'য়ে নাচে গোঁসাঁয়ায়।
অঙ্গ হতে অদ্ভুত তেজ বাহিরায়॥
ইহা দেখি সেই ধনী মনে চমকিল।
চরণ তলেতে পড়ি আশ্রয় লইল॥"

(গোবিন্দদাসের কড়চা)

প্রেমময়ের সেই প্রেমমূর্ত্তি দর্শনে ও তৎশ্রীমুখে মধুর হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন শ্রবণে মহাপাপী দুরাচারিগণও পরম ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জগাই মাধাই, মুসলমান কাজী, তীর্থরাম প্রভৃতি তাহার জলন্ত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

গুর্জ্জরী নগরে তাঁহার প্রেমের একটি উজ্জ্বল চিত্র গোবিন্দ দাস স্বীয় কড়চায় এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—

"এক বলি কৃষ্ণহে বলিয়া ডাক দিল।
সে স্থান অমনি যেন বৈকুণ্ঠ হইল॥
অনুকূল বায়ু তবে বহিতে লাগিল।
দলে দলে গ্রাম্য লোক আসি দেখা দিল॥
ছুটিল পদ্মের গন্ধ বিমোহিত করি।
অজ্ঞান হইয়া নাম করে গৌর হরি॥
প্রভুর মুখের পানে সবার নয়ন।
ঝর ঝর করি অশ্রু পড়ে অনুক্ষণ॥
বড় বড় মহারাষ্ট্রী আসি দলে দলে।
শুনিতে লাগিল নাম মিলিয়া সকলে॥

....

অসংখ্য বৈষ্ণব শৈব সন্ন্যাসী জুটিয়া।
হরিনাম শুনিতেছে নয়ন মুদিয়া॥"

প্রভুর দর্শনে তৎকালে মানবচিত্ত কিরূপ বিমোহিত হইত, সংক্ষেপে তাহা দেখান গেল। কিন্তু প্রভুর প্রেমময় সেই শান্তিপূর্ণ করুণমূর্ত্তিখানি দৃষ্টে যে কেবল মানবচিত্ত মাতিয়া উঠিত, তাহা নহে, কাণ্ডজ্ঞানহীন পশুপক্ষিগণ পর্য্যন্ত প্রেম-রসে আপ্লুত হইয়া উঠিত। যথা—

এক দিন পথে ব্যাঘ্র করিয়াছে শয়ন।
আবেশে তার গায়ে প্রভুর লাগিল চরণ॥
প্রভু কহে কহ কৃষ্ণ ব্যাঘ্র উঠিল।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি ব্যাঘ্র নাচিতে লাগিল॥
আর দিনে মহাপ্রভু করে নদী-স্নান।
মত্ত হস্তিযূথ আইল করিতে জলপান॥
প্রভু জলে কৃত্য করেন আগে হস্তী আইলা,
কৃষ্ণ কহ বলি প্রভু জলকেলি যাইলা।
সেই জলবিন্দুকণা লাগে যার গায়।

সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে প্রেমে নাচে গায়॥"*

চৈঃ চঃ

এপর্য্যন্ত যাহা আলোচনা করা গেল, তাহা তাঁহার সাধারণ প্রেমের অবস্থামাত্র। তাঁহার কমনীয় হৃদয়ে কিরূপ গাঢ় প্রেমোচ্ছ্বাস প্রবাহিত হইয়া জগৎ প্লাবিত করিয়াছিল, বারান্তরে তদ্বিষয় আলোচনা করিবার বাসনা রহিল। (ক্রমশঃ)

শ্রীমতী নগেন্দ্রবালা দাসী।

* ভক্তগণ চিরকাল সাধুদিগের অলৌকিক গুণ-কার্য্যের বর্ণনায় অনুরাগী, কিন্তু সাধুগণ নিজে তাহার তত মাহাত্ম্য স্বীকার করেন না। বা,বো,স।

দেবী কৈলাসকামিনীর স্মরণার্থ।

১০ মাস হইল সাধ্বী কৈলাসকামিনী পরলোকগতা হইয়াছেন। প্রথম এক মাস তাঁহার জন্য প্রতিদিন নিয়মিত প্রার্থনাদি যেরূপ হইয়াছে এবং পশ্চাত্য় তাঁহার আদ্যশ্রাদ্ধ ক্রিয়া যেরূপে সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার বিবরণ বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি ১লা বৈশাখ দেহত্যাগ করেন, প্রতি মাসের ১লা তারিখে বিশেষ উপাসনাপূর্ব্বক তাঁহার শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। একটী মাসিক শ্রাদ্ধে, কোনও সুশিক্ষিতা সম্ভ্রান্তা মহিলা হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত প্রীতিতে তাঁহার জীবনের যে ছবি অঙ্কিত করেন, তাহা পঠিত হয়। পাঠিকাদিগের গোচরার্থ তাহা নিয়ে প্রকটিত হইল। তাঁহার স্মরণার্থ পচম্বায় ও হরিনাভিতে দুইটী স্মৃতিচিহ্ন নির্ম্মিত হইয়াছে। অনেকগুলি আত্মীয় বন্ধু লইয়া তাঁহার বাণ্মাসিক শ্রাদ্ধক্রিয়া যথাসময়ে সম্পন্ন হইয়াছে। গত অগ্রহায়ণ মাসে তাঁহারই মনোনীত একটী পাত্রের সহিত তাঁহার মধ্যমা কন্যার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহার বিবরণ অন্যত্র দৃষ্ট হইবে।

দেবী কৈলাসকামিনীর বিয়োগে আক্ষেপ করিয়া যে সকল সহৃদয় মহাত্মা ও মহোদয়া আমাদিগের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট আমরা চিরকৃতজ্ঞ। তাঁহাদিগের প্রত্যেকের নিকট বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা আমাদের সাধ্যের অতীত, এজন্য তাঁহারা ক্ষমা করিবেন। কলিকাতার বহুসংখ্যক বন্ধুবান্ধব দুঃসময়ে শোকার্ত্ত পরিবারদিগের প্রতি যেরূপ স্নেহ ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা আমাদিগের চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। দূরদূরান্তর হইতেও অনেক সহৃদয় ব্যক্তি শোকলিপি দ্বারা আমাদের হৃদয়ে সান্ত্বনা বর্ষণ করিয়াছেন। এক একখানি লিপি এরূপ হৃদয়স্পর্শী যে, বোধ হয় যেন তাহার মধ্যে করুণা ও সমবেদনামূর্ত্তিমতী। সহানুভূতিকারী বন্ধুদিগের মধ্যে কতকগুলির নাম আমরা এখানে উল্লেখ মাত্র করিতেছি, ইহাতে আমাদের শোকসান্ত্বনার জন্য করুণাময় পরমেশ্বরের প্রেমালিঙ্গন কত হৃদয় প্রণিত করিয়া কত বিস্তৃতভাবে আমাদিগকে আবেষ্টন করিয়াছে, সকলে বুঝিতে পারিবেন।

ইহাদের মঙ্গলেচ্ছায় স্বর্গীয় আত্মা শান্তি লাভ করিতেছেন এবং আমাদিগেরও তপ্ত হৃদয় অনেক পরিমাণে শান্ত হইয়াছে। মঙ্গলময় বিধাতার নিকট প্রার্থনা করি,তিনি আমাদের বিপৎকালের বন্ধুগণের আন্তরিক সদ্ভাবের প্রচুর পুরস্কার বিধান করুন্।

যাঁহাদিগের নিকট হইতে সহানুভূতিপত্র পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের কতকগুলির নাম ঃ—

মিসী জে, বি, নাইট, ইংলণ্ড; বিবী উইনস, চিঁচুড়া; পণ্ডিত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী ও তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণী, শ্রীক্ষেত্র; কুচবিহারের মাননীয়া মহারাণী ও তাঁহার ভগিনীগণ, শ্রীমতী মানকুমারী, সাগরদাঁড়ী; অন্নদাসুন্দরী দাস গুপ্তা, রঙ্গপুর; রেবা রায়, কটক; সুশীলা সিংহ, বর্দ্ধমান; নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী, হুগলী; সুমতি মজুমদার, সমস্তিপুর; বসন্তবালা ঘোষ, শর্ম্মিষ্ঠা চন্দ, ময়মনসিংহ; বসন্তকুমারী দাসী, রাজপুর; স্বর্ণপ্রভা বসু, দার্জিলিং; বাবু আনন্দমোহন বসু, কেম্ব্রিজ; রায় রাধিকাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বাহাদুর; বাবু পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়, বেরিলি; অবিনাশচন্দ্র মজুমদার সস্ত্রীক, লাহোর; ভাই কাশী রাম, আম্বোর; বাবু নিবারণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভাগলপুর; বাবু যোগীন্দ্রনাথ বসু, দেওঘর; রাজ নারায়ণ বসু, ঐ; পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী, আবগাও কবিরাজ দ্বারকা নাথ রায়, ত্রিবেণী; বাবু হেমেন্দ্র-নাথ সিংহ, ময়ূরভঞ্জ; করুণাদাস বসু, বাঁকুড়া; বরদাদাস বসু, রামপুর বোয়ালিয়া; বিহারীলাল ঘোষ, লক্ষ্ণৌ; গুরুচরণ মহালনবিস, মধুপুর; ডাক্তার নিস্তারণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, খুরদা; অভয়াচরণ বসু, প্যারীলাল ঘোষ, এম, এ, মেদিনীপুর; রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এলাহাবাদ; কৈলাসচন্দ্র দাস গুপ্ত, এম, এ, রঙ্গপুর; অমৃতলাল সান্যাল, জিসলমর, বারিষ্টার পি, দত্ত, হোসাঙ্গাবাদ; মেঃ ও মিসেস কে এন রায়, পাবনা; শশিভূষণ মিত্র, রেঙ্গুন; ভগবতীচরণ ঘোষ, মুঙ্গের; গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এ, ময়মনসিংহ; মহীন্দ্র মোহন চন্দ, ঐ; কিশোরীমোহন রায়, কাকীনা; অম্বিকাচরণ মিত্র এম, এ, বহরমপুর; গোপাল চন্দ্র সেন, গিরিডি; তিনকড়ী বসু, শ্রীরামপুর; যতীন্দ্রমোহন বসু, আসাম; চারুচন্দ্র নাগ, এম, এ, বি, এল, খুলনা; রাধারমণ সিংহ, ভাগলপুর; ডাক্তার জে, সি, বসু, দার্জিলিং; আনন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বালেশ্বর; কালীনাথ দত্ত, মজিলপুর; নবীনচন্দ্র দত্ত, উমাচরণ মিত্র, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়; শ্রীমতী হেমকুসুম মল্লিক, বাঁকীপুর।

প্রেরিত বিবরণী।

কৈলাসকামিনী দেবী বাল্যকাল অবধি ব্রাহ্ম সমাজের সকলের নিকটেই নিজগুণে সুপরিচিত ছিলেন। তাঁহার অকালে পৃথিবী ত্যাগ যে শুধু স্বামী ও সন্তানদেরই শোকের কারণ হইয়াছে, তাহা নহে; অনেক হৃদয়ই তাঁহার বিচ্ছেদের তীব্রতা অনুভব করিয়া বিশেষ কাতর। সেই গুণবতী সতীর অকাল-মৃত্যুতে অনেক চক্ষু শোকাশ্রু প্রবাহিত করিয়াছে। আমিও তাহাদেরই একজন।

প্রথম জীবনে যখন কলিকাতা আমার নিকটে অপরিচিত ও নূতন স্থান ছিল, তখন ভারতাশ্রমের "শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে" কৈলাসকামিনীকে প্রথম দর্শন করি। সে আজ ২৬ বৎসরের কথা। ক্রমে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ হইলাম। তাঁহার বিবিধ সদ্গুণ

দর্শন করিয়া হৃদয় মুগ্ধ হইল। আমাদের পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ মাত্রেই হৃদয়ের আবরণ উদ্ঘাটিত হইয়া যাইত। ১৫ মিনিট সাক্ষাতেও স্বামী, গৃহাদি, আধ্যাত্মিক উন্নতি অবনতির সংবাদ কিছুই আমার নিকট অপ্রকাশিত রাখিতেন না। তাঁহার জীবনের সুখ-দুঃখ-কাহিনী সকলই আমার বিদিত ছিল। তাঁহার নিকট হৃদয় খুলিয়া আমি সর্ব্বদা যে সহানুভূতি ও উন্নত-ভাব-ব্যঞ্জক কথাগুলি শুনিয়া যে তৃপ্তি অনুভব করিয়াছি, জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত তাহা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে স্মরণ করিব। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবতী রমণী ছিলেন। সংসারের নানা গোলমালে অনুক্ষণ ব্যস্ত থাকিয়াও আত্মোন্নতির জন্য কঠোর নিয়মের অধীন থাকিয়া ব্রাহ্ম মহিলার কর্ত্তব্য যে ভাবে পালন করিতেন, তাহা বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মিকাগণের পক্ষে সর্ব্বতোভাবে অনুকরণীয়। স্বামী উচ্চ শ্রেণীর সাধু পুরুষের যোগ্য সংসার হইতে নির্লিপ্ত ভাবে জীবনের কর্ত্তব্য রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন, সংসার, টাকা কড়ি, ছেলেদের শিক্ষা কোনও বিষয়েই সংবাদ রাখিতেন না। কৈলাসকামিনী জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অনাসুষিক ধৈর্য্য সহকারে এতগুলি সন্তানের লালন পালন, শিক্ষা দান, সংসারিক সকল কর্ত্তব্য সাধন নীরবে সম্পন্ন করিয়া গিয়াছেন। স্বামীর উচ্চ জীবনের মহত্ব বুঝিয়া সাংসারিক কোনও বিষয়ের জন্য কখনও তাঁহার বিরক্তি কি অশান্তি উৎপাদন করেন নাই। স্বামীকে সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ের অনুরূপ কার্য্য অবাধে করিতে দেওয়া তিনি আপনার জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য বোধ করিতেন। এ সম্বন্ধে তিনি উচ্চ প্রশংসা ও সম্মানলাভের সর্ব্বথা উপযুক্ত। এমন নিঃস্বার্থভাবে ও সন্তুষ্টচিত্তে স্বামীর স্কন্ধ হইতে সংসারের সকল ভার গ্রহণ করিতে অল্প রমণীকেই অগ্রসর দেখিয়াছি। সাধু পুরুষের সহধর্ম্মিণী বলিয়া কোন গর্ব্বের ভাব তাঁহার উন্নত হৃদয়ে স্থান পাইত না। স্বামী ব্রাহ্ম, সুতরাং তিনিও ব্রাহ্মিকা, এ ভাব কখনও তিনি হৃদয়ে পোষণ করিতেন না। বরং সর্ব্ব প্রকারে আপনাকে স্বামীর অনুপযুক্ত মনে করিতেন।

এতগুলি সন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ ও সংসারের নানা কার্য্যে নিয়ত ব্যস্ত থাকিয়াও আত্মচিন্তা ও আত্মোন্নতির জন্য নিয়ত চেষ্টা পাইতেন। এ গুণটী ব্রাহ্ম সমাজে যাঁহারা নূতন প্রবেশ করিতেছেন, তাঁহারা যদি স্মরণ রাখিয়া চলেন, সমাজের অনেক উন্নতি হইতে পারে। তিনি অত্যন্ত শ্রমশীল ও সাংসারিক কার্য্যে সুনিপুণা ছিলেন। মিতব্যয়িতা গুণ তাঁহার বিশেষ অভ্যস্ত ছিল। বিলাসিতা তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। তাঁহার স্বামীর আয় এত বৃহৎ পরিবারের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। অথচ এই আয় হইতেই তিনি যে ভাবে কন্যার বিবাহ, পুত্র কন্যা দৌহিত্রের নামকরণ, গৃহনির্ম্মাণ, প্রভৃতিকার্য্য সম্পন্ন করিতেন এবং বন্ধু-

গণের সহিত সামাজিকতা রক্ষা করিয়া চলিতেন, তাহাতে শত মুখে তাঁহার মিতব্যয়িতা গুণের প্রশংসা করিতে হয়। আলস্যের বশীভূত হইয়া বৃথা সময় নষ্ট করা পাপজনক কার্য্য বলিয়া তাঁহার ধারণা ছিল। ভৃত্য কিম্বা কন্যাদের হস্তে সংসারের দৈনিক কার্য্যভার অর্পণ করিয়া অসুস্থতার সময়েও তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন নাই। কি উপায়ে পরিবারস্থ সকলকে সুখ সচ্ছন্দে রাখিবেন, অনুক্ষণ কেবল তাহার উপায়ই অন্বেষণ করিতেন। স্বামীর প্রতি অচল শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিয়া নিঃস্বার্থভাবে তাঁহার যে ভাবে সেবা করিয়াছেন, আমরা তাহা দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি এবং তিনি যে উদার হৃদয় লইয়া সংসারে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, শত মুখে তাহার প্রশংসা করিয়াছি। বৃথা অভিমান কি আবদার করিয়া স্বামীকে কদাচ উৎপীড়িত করেন নাই। কার্য্যানুরোধে তাঁহার স্বামী মহাশয় আহারের সময় পর্য্যন্ত গৃহে আগমন করিতে অক্ষম হইয়াছেন। তিনি কতই যত্ন ও প্রীতি সহকারে একটী কৌটার মধ্যে খাদ্য সামগ্রী আবদ্ধ করিয়া যথাস্থানে প্রেরণ করিতেন। এজন্য কখনও তাঁহার মুখমণ্ডলে বিষণ্ণতার চিহ্ন দর্শন করি নাই। স্বামীর হৃদয়ের গতি কোন্ দিকে তাহা বুঝিয়া সকল দায়িত্ব গোলমাল নিজ স্কন্ধে বহনপূর্ব্বক তাঁহাকে নিশ্চিন্তমনে ঈশ্বরের সেবা করিবার সুযোগ দিয়াছেন। কয়জন রমণী এরূপ নিঃস্বার্থভাবে পতির সাহায্য করিতে সক্ষম তাহা জানি না। সকল প্রকার সাধু কার্য্যে তিনি সহানুভূতি প্রকাশ করিতেন এবং প্রকৃত নিষ্ঠা সহকারে নীরবে ঈশ্বরের সেবা করিয়া পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

তিনি স্বাধীনপ্রকৃতি ও উচিতবক্তা রমণী ছিলেন। চক্ষুলজ্জার অনুরোধে বিশ্বাসের বিরুদ্ধ কোনও কার্য্যের প্রশ্রয় দিতেন না। সর্ব্বতোভাবে স্বামীর অনুসরণ করিয়াও চির দিন আপনার স্বাধীন মত ও বিশ্বাস রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন।

ভগ্নী কৈলাসকামিনী দেবীর সহিত কার্য্যক্ষেত্রে ও ধর্ম্মসমাজে ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইয়া দীর্ঘকাল কার্য্য করিয়াছি। এক দিনের জন্যও কদাচ কোনও বিষয়ে মনোমালিন্য জন্মে নাই। এরূপ মহিলার সহিত একত্রে কার্য্য করা পরম প্রীতিকর মনে হইয়াছে। কয়েক বৎসর তিনি বঙ্গমহিলা সমাজের সম্পাদিকার পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া বিচক্ষণতা সহকারে কর্ত্তব্যকার্য্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। স্ত্রী-সমাজের উন্নতির জন্য সর্ব্বদা তাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হইত। এরূপ গুণবতী মহিলা অকালে পৃথিবী হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বন্ধুবান্ধবকে যেরূপ শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়াছেন, তাহা বর্ণনীয় নহে। তাঁহার যশঃসৌরভ ব্রাহ্মসমাজে অবিকৃত থাকিবে। আশা করি, তাঁহার শিক্ষিতা কন্যারা নিজ নিজ জীবনে মাতার সদ্‌গুণ সকলের অনুকরণ করিয়া ধন্যা হইবেন। শ্রীম—

ময়ূর সিংহাসন।

সম্রাট্ সাহাজাহানের দুইটী কীর্ত্তি জগদ্‌বিখ্যাত,—এক আগ্রার তাজমহল, দ্বিতীয় তখত-তউস ময়ূর সিংহাসন। তাজমহল স্থাপত্যবিদ্যার অত্যাশ্চর্য্য কীর্ত্তি। তাহা দেখিয়া আজিও সভ্যজগতের লোক মুগ্ধ হইয়া থাকে। সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পরিব্রাজক বর্ণিয়ার এই তাজমহল সম্বন্ধে সর্ব্বপ্রথম লিখিয়া যান—"ইহা জগতের আশ্চর্য্য কয়েকটীর মধ্যে অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইবার উপযুক্ত। দুই বার মিসরের পিরামিড দেখিয়াছি,ইহার সহিত তুলনায় মিসরের পিরামিডগুলি স্তূপ (ঢিবি) মাত্র।" বর্ণিয়ার এ তুলনায় তাজমহলের বাহ্যিক সৌন্দর্য্য, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের অপূর্ব্ব প্রতিভারই সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন,—অন্য বিষয়ে যাহাই হউক, তাজমহল যে ভুবন-মনোহর পুরী, সভ্য জগৎ আজিও সে কথা স্বীকার করেন।

ময়ূর সিংহাসন সম্রাট্ সাহাজাহানের আদেশে বিনির্ম্মিত হয়। পর্য্যটকবর বর্ণিয়ার স্বচক্ষে সম্রাট আরংজেবকে এই অতি বিচিত্র সিংহাসনে সমাসীন দেখিয়া গিয়াছেন। দেখিয়া যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলেন, যাহা বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্তে তাহা সন্নিবেশিত রহিয়াছে। নিম্নে তাঁহারই কথায় তাঁহার বর্ণিত বিষয়ের ভাব মাত্র প্রকটিত হইল।—

"রাজসভার বিশাল চত্বরে সম্রাট্ সিংহাসনে সমাসীন রহিয়াছেন। তাঁহার পরিধানে অতি সূক্ষ্ম বুটিতোলা অপূর্ব্ব শ্বেত রেসমের পরিচ্ছদ, তাহাতে রেসম ও সোণার জরির বিচিত্র কাজ করা। মস্তকে কিংখাবের উষ্ণীষ, তাহাতে মহামূল্য মুকুট, তাহার নিম্নদেশ দুর্লভ হীরকখণ্ডসমূহে খচিত, মধ্যে অন্য এক ভাস্বর রত্ন সূর্য্যের ন্যায় প্রদীপ্ত রহিয়াছে। সম্রাটের কণ্ঠে বিমল মুক্তাহার, তাহা নাভিদেশের অধোভাগ পর্য্যন্ত বিলম্বিত রহিয়াছে। সম্রাট্ যে সিংহাসনে উপবিষ্ট, তাহার ছয় পদ—প্রতি পদ অতি স্থূলস্বর্ণখণ্ডখচিত, তাহার সর্ব্বত্র হীরক,মরকত ও পান্নাতে ভূষিত। তাহাতে যে সমস্ত মহামূল্য প্রস্তরাদি রহিয়াছে, তাহা যে সংখ্যায় কত অথবা তাহাদের মূল্য যে কত তাহা আমার অজ্ঞাত; কারণ কাহারও সে সিংহাসনের সমীপস্থ হইবার অধিকার নাই। তবে দেখিয়া যাহা বুঝিয়াছি, তাহাতে সিংহাসনের মূল্য চারি ক্রোর টাকার ন্যূন নহে।

সম্রাট্ সাহাজাহান এই সিংহাসন প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। বহু দিন হইতে বহু রাজ্য-লুণ্ঠনলব্ধ আমীর-ওমরাগণ প্রদত্ত বিবিধ রত্নাদি রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত রহিয়াছিল। তাহাই সাহাজাহান মোগল দিল্লীশ্বরের ঐশ্বর্য্যগরিমা দেখাইবার জন্য সিংহাসননির্ম্মাণে ব্যবহার করেন।

সিংহাসনের অন্যান্য অংশ তাদৃশ চমৎকার না হইলেও মণিমুক্তাখচিত ময়ূর-মুখের প্রতিকৃতি অতি সুগঠিত,—বিস্ময়কর; কারুকার্য্যে বিপুলকীর্ত্তি এক ফরাসী তাহা গড়িয়াছিল। ঐ ব্যক্তি কৃত্রিম রত্নাদি নির্ম্মাণ করিতে পারিত; কৃত্রিম রত্নাদি বিক্রয় করিয়া সে ভারতবর্ষের অনেকানেক রাজাকে প্রতারণা করিয়াছিল। অবশেষে সে দিল্লীর বাদসাহের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং তথায় সাহাজাহানের আদেশে এই জ্যোতির্ম্ময় বিচিত্র সিংহাসন নির্ম্মাণ করিয়া দেয়।"

কালবশে ময়ূর সিংহাসন বিগত—নাদির সাহ তাহা হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, আর তাহা ভারতে নাই। দুইটী কীর্ত্তির এক কীর্ত্তি অদৃশ্য—স্মৃতিমাত্রে অবস্থিত, আর এক কীর্ত্তি এখনও রহিয়াছে, কিন্তু তাহাও বুঝি শোভাভ্রষ্ট ও হীনমূল্য হইয়াছে। কালের অনুগ্রহে কত দিন ভূপৃষ্ঠে বর্ত্তমান থাকিবে, তাহা কে বলিতে পারে?

অর্গলের রাণী।

সে আজ প্রায় সাত শত বৎসরের কথা, এখনকার এলাহাবাদ নগরের নিকটে অর্গল নামে একটি হিন্দুরাজধানী ছিল। অর্গল-পতি গৌতম তাঁহার স্বদেশপ্রেম ও মহাপ্রাণতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। কিন্তু তাঁহা হইতেও তাঁহার অতুলনীয়া প্রিয়তমা পত্নী আপনার ভুবনমোহন গুণে দেশবাসীর হৃদয় অধিকতর আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শতাব্দীর পর শতাব্দী কালস্রোতে ডুবিয়া গিয়াছে, আজও অর্গলের নরনারী বীররাণীর যুগান্তকালের বীরত্বকাহিনী স্মরণে সুখবোধ করে, আজও সে দেশের সকলে উচ্ছ্বাসিত-হৃদয়ে, মিলিতকণ্ঠে লোকললাম রাণীর বীরকীর্ত্তি গান করিতে করিতে তাহাদের দৈনন্দিন শ্রমশান্তি করে।

রাজা গৌতম যখন মুসলমান সম্রাটকে কর দিতে অস্বীকার করিলেন, নসরুদ্দীন সাহ তখন দিল্লীর সিংহাসনে উপবিষ্ট। ক্ষুদ্র অর্গল অমিতপ্রতাপ দিল্লীর সহিত তুলনায় আপন ক্ষমতার স্পর্দ্ধা করিতেছে, ইহা সম্রাট্ নীরবে সহিলেন। অবিলম্বে তিনি অযোধ্যার মুসলমান শাসনকর্ত্তার প্রতি অর্গলরাজের উপযুক্ত শাস্তি বিধানের আদেশ প্রচার করিবামাত্র অযোধ্যার কৃতপ্রতিজ্ঞ শাসনকর্ত্তা সুশিক্ষিত বৃহৎ সৈন্যদল সঙ্গে অর্গলরাজ্যের দিকে অগ্রসর হইলেন। ক্ষুদ্র হিন্দুরাজা গৌতমকে নিশ্চয়ই শৃঙ্খল বন্ধনে দিল্লীরাজ সমীপে উপস্থিত করিবেন এই সুখকর কল্পনায় সেনাপতি ও তাঁহার রণোৎসাহী সৈন্যদলের সুখের অবধি রহিল না

কিন্তু সকলে যাহা ভাবিয়াছিল, ফলে তাহার বিপরীত ঘটিল,—দিল্লী-সম্রাটের গৌরব-পতাকা অর্গলরাজের প্রবল আঘাতে ধূলাবলুণ্ঠিত হইল। গর্ব্বিত দিল্লী-সৈন্য অন্যায়রূপে অর্গল নগরের নিকটে উপস্থিত হইলে রাজা গৌতম ও তাঁহার দেশবাসী সকলেই ঘৃণা ও ক্রোধে বড়ই উত্তেজিত হইলেন,—মাতৃভূমির প্রতি এই অপমানের প্রতিশোধ লইতে হৃদয়ের শোণিতপাত তাঁহাদের পণ হইল। রাজা গৌতম আনন্দে স্বদেশ-বৎসল বীরদের সেনাপতির স্থান গ্রহণ করিলেন; দেখিতে দেখিতে উভয়পক্ষে প্রবল রণাভিনয় আরম্ভ হইল—আহত ও ব্যথিতের আর্ত্তস্বরে চারি দিক্ পূর্ণ হইল। কিন্তু রাজা গৌতম অতি অল্প সময়ের মধ্যে শত্রুসেনা সম্পূর্ণ পরাস্ত করিলেন। রণক্ষেত্রে দশ সহস্র শত্রু-সৈন্য নিহত হইল। পরাজিত সেনাপতি কষ্টে সৃষ্টে অবশিষ্ট সেনাসহ প্রাণে প্রাণে পলায়ন করিতে সমর্থ হইলেন।

বিজয়ী বীরদের অবিশ্রাম জয়ধ্বনি দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইল। তখন হিন্দুসেনা দিল্লীর রাজচিহ্নিত পতাকা অধিকার করিয়াছে; দিল্লীর অধিকৃত রাজ্যেও অর্গলরাজের রাজপতাকা উড়িয়াছে; গৃহে গৃহে বিজয়োৎসব আরম্ভ হইল। মাতৃভূমির সম্মানরক্ষক বিজয়ী বীরপুত্রেরা আজ গৃহে ফিরিতেছেন, তাই তাঁহাদের প্রতি অর্গলের সমুদায় রমণীর প্রতিনিধিরূপে রাজরাণী নানাপ্রকারে কৃতজ্ঞতা ও অনুরাগ-চিহ্ন প্রকাশ করিলেন। অতুলনীয়-রূপ-গুণাধিকা রাণীর হস্তে সমুদায় রমণীকুলের এই স্বেচ্ছাপ্রদত্ত অনুপম অনুরাগ-চিহ্ন-লাভে সকলেই স্বদেশের জন্য রণক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জ্জন করা পরমবাঞ্ছিত মনে করিল। রণজয়ী রাজা গৌতম যথাকালে রাজপ্রাসাদে প্রিয় পরিজনের সহিত সম্মিলিত হইলেন। অবিলম্বে যুদ্ধজয়ের স্মরণার্থ রাজার নিমন্ত্রণপত্র প্রচারিত হইল। সে শুভ অনুষ্ঠানে অর্গলরাজ্যের স্ত্রী পুরুষ, বালক বালিকা ও জাতিনির্ব্বিশেষে সকলকেই সাদরে নিমন্ত্রণ করা হইল। সে আনন্দ-উৎসবে অর্গলের সকলেই সংসারের অন্যকথা ভুলিল। দিনের পর দিন যায়, জাতীয় বিজয়োৎসবে সকলেই যেন আত্মহারা! এই মহা গৌরব ও আনন্দ যাঁহাদের যুদ্ধক্ষেত্রের নিদারুণ অগ্নি ও অস্ত্রের মধ্যে অর্জ্জিত, তাঁহাদের আনন্দ অপেক্ষাও এই ঘটনায় আর একজনের সুখোচ্ছ্বাস অধিক প্রকাশ পাইতেছিল। সেই এক জনের উৎসাহ ও আনন্দের মাধুরী অর্গলের সমুদায় নর-নারীর হৃদয়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার করিতেছিল। বিস্মিত হইয়া সকলেই দেখিল বিজয়োৎসবে তাহাদের নিরুপমা রাণী এবং তাঁহার প্রিয় সহচরীরা যেমন উচ্ছ্বসিত ও আবেগপূর্ণহৃদয়ে যোগ দিয়াছেন, এমন আর কেহই নহে। সকলেই রাজধানীর বিজয়োৎসব-নিমন্ত্রণে তাহাদের বীর রাজা অপেক্ষা পুণ্যময়ী রাজ্ঞীর

কোমল, সোৎসুক ও সযত্ন আতিথেয়তায় সুখী হইতেছিল। সেই সর্ব্বাবয়বসুন্দর মহোৎসবের প্রত্যেক অনুষ্ঠান ও শোভা সজ্জার মধ্যে রাণীর উদ্বেলিত সহৃদয়তা এবং কোমল শিল্পনিপুণ হস্তচিহ্ন বর্ণে বর্ণে প্রতিভাত হইতেছিল। এই অপূর্ব্ব রমণীর আদর্শ স্বভাবের প্রভাব অর্গলের সমুদায় সুন্দরীকুলকে স্বদেশপ্রেমের এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব সুখাস্বাদ উপভোগ করাইয়া জাতীয় উৎসব ও একতার মহৎ অনুষ্ঠানে সুখদুঃখের অংশী করিল। রমণীরা এত দিন শুধু গার্হস্থ্য কর্ত্তব্যে পতি-পুত্র-ভ্রাতার সুখদুঃখের সঙ্গিনী ছিলেন, এখন হইতে সকল সুখ দুঃখেরই সমভাগিনী হইলেন। পূর্ব্বে প্রেমিক পতি একাকী কঠিন কর্ম্মক্ষেত্রে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে করিতে শুষ্কহৃদয় হইতেছিলেন, কিন্তু এখন পতির সহিত সম্মিলিত পত্নী কঠিনে কোমলে মিশিলে মরুভূমিতে জলসিঞ্চন হইল; পূর্ব্বে স্বভাবদুর্ব্বল ভাই একাকী নিদারুণ কঠোরতার মধ্যে থাকিতে থাকিতে দৃঢ়তার সংকল্প পরিত্যাগে উদ্যত হইতেছিল, কিন্তু এখন স্নেহময়ী ভগিনী আশা, উৎসাহ ও আদরের সঞ্জীবনী সুধা হস্তে লইয়া ভাইয়ের পার্শ্বে দাঁড়াইলে ভাই কত শান্তি লাভ করিল। জাতীয় গৌরব ও উন্নতির এই উচ্চ আদর্শ দ্বারা সেই সাত শত বৎসর পূর্ব্বে একটী সুকোমলা সুন্দরী তাঁহার স্বদেশবাসী নরনারীকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিলেন, তাই সেই যুগান্তব্যাপী জাতীয় গৌরবের সত্য-কাহিনী ইতিহাসে চির-অঙ্কিত আছে। যাহা হউক, বিজয়োৎসব বড়ই আমোদে আহ্লাদে পরিসমাপ্ত হইল। অবশেষে বীরপুত্র-কন্যারা তাঁহাদের রাজা ও রাণীর নিকট বিদায় লইলেন।

উৎসবান্তে এক দিন রাণী সহচরীদিগের সহিত প্রাসাদশীর্ষ হইতে সুনীল আকাশে শুক্লপক্ষের চাঁদ দেখিতেছিলেন গঙ্গাস্নানের পুণ্যতিথি নিকটবর্ত্তী হঠাৎ মনে হইল। সেই শুভদিনে ভাগীরথীর পবিত্র সলিলে অস্নাত থাকিলে নিশ্চয়ই গৃহের অমঙ্গল হইবে, এই চিন্তায় পুরনারীদের সহিত রাণী অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন। তাঁহাদের ব্যাকুল হইবার বিশেষ কারণ ছিল। ভাগীরথী রাজধানীর নিতান্ত নিকটে নহে—কয়েক ক্রোশ ব্যবধানে। কেবল তাহাই নয়, সেই ভাগীরথীর উভয় পার্শ্বে হতমান, আহত দিল্লীসৈন্য প্রতিশোধ-পিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার আশায় তখনও বাস করিতেছিল। এত বিঘ্নসত্বে রাণীর পুণ্যদিনে গঙ্গাস্নানবাসনা নিবৃত্ত হইল না। কিন্তু, সেই শত্রুসৈন্যপূর্ণ গঙ্গাতীর হইতে তিনি কেমন করিয়া নিরাপদে গৃহে ফিরিবেন, তাহাই তখন তাঁহার চিন্তার বিষয় হইল। অর্গলের রূপযৌবনসম্পন্না রাজরাণী সহস্র ক্ষুধিত-শার্দ্দূলোপম বিজাতীয় শত্রুসৈন্যের মধ্যে গঙ্গায় স্নান করিতে যাইবেন, ইহা কখনই রাজার অভিপ্রেত হইবে না, এ কথাও তিনি উত্তমরূপে

বুঝিলেন। কিন্তু প্রবল ইচ্ছার নিকট সকল বিঘ্নই অপসারিত হইল। রাজার সম্মতি প্রার্থনা করিলে পাছে মনোরথ ভঙ্গ হয়, এই জন্য গোপনে স্থির হইল কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট সহচরী সঙ্গে লইয়া সাধারণ যাত্রীর মত রাণী রজনীতে প্রাসাদ পরিত্যাগ করিবেন এবং অতি প্রত্যূষেই গঙ্গাস্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন। কত অসংখ্য যাত্রী সে দিন গঙ্গাস্নান করিবে, তাহার মধ্যে কে আর তাঁহাকে অর্গলের রাজরাণী বলিয়া চিনিতে পারিবে? শুভ অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য এই নূতন উপায় স্থির হইলে নিশ্চিন্তমনা রাণী সখীদের সঙ্গে নির্দ্দিষ্ট তিথির নিস্তব্ধ নিশীথে রাজপ্রাসাদ হইতে উন্মুক্ত প্রান্তরের পথে উপস্থিত হইলেন। নির্জ্জন রজনীতে তাঁহারা দ্রুতপদে প্রান্তরের পর প্রান্তর, লোকালয়ের পর লোকালয়, বনোদ্যানের পর বনোদ্যান অতিক্রম করিতে করিতে যখন প্রভাতের সুশীতল বায়ু অনুভব করিলেন, যখন নীলাকাশে উজ্জ্বল তারকামালা ক্রমে পরিম্লান দেখা গেল, নিদ্রোত্থিত প্রভাতের পাখী যখন সুমধুর সঙ্গীতে সুদিন সম্ভাষণ করিল, তখন প্রফুল্লিত রাজান্তঃপুরবাসিনীরা দেখিলেন সম্মুখেই উষার রক্তিমরাগরঞ্জিত-হৃদয়া জননী জাহ্নবী। কিন্তু তাঁহারাই সর্ব্বাগ্রে আসেন নাই;— কত যাত্রী রাত্রি থাকিতেই স্নানার্থ নদীতীরে সূর্য্যোদয়ের অপেক্ষা করিতেছিল। ক্রমে প্রভাত হইতে না হইতে অসংখ্য নরনারীর উৎসাহ-কোলাহলে নদীতীর উৎসবময় হইল। সূর্য্যদেব দেখা দিলেন, বিশ্বাসিগণের স্তবস্তুতিগানে চারি দিক্ প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল, ত্রিতাপজ্বালা জুড়াইবার আশায় নরনারী সুস্নিগ্ধ পবিত্রস্রোতে সাধ মিটাইয়া অবগাহন করিতে লাগিল।

রাণী ও সহচরীগণ এ পর্য্যন্ত তাঁহাদের কোনই বিপদ্-চিহ্ন দেখিতে পান নাই। কিন্তু তাঁহার মত ভুবনমোহিনী সুন্দরী যে পার্শ্ববর্ত্তী স্নানার্থী নরনারীর নির্দ্দোষ কৌতূহলদৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন না, ইহা সম্ভব নহে। ফলে রাণীর প্রতি ক্রমে অনেকেরই দৃষ্টি পড়িল, এবং কোন কোন পুরুষ ও রমণীর কৌতূহল-জিজ্ঞাসা হইতেও রাজান্তঃপুরবাসিনীরা নিস্তার পাইলেন না। গঙ্গাতীরে রাজরাণীর মত না আসিলেও নিরাভরণা রাজ্ঞীর স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য ত লুকাইবার সামগ্রী নয়, তাই তাঁহারা এত জিজ্ঞাসিত হইতেছেন। বাস্তবিক, সুরূপা রাজলক্ষ্মীর অনুপম দেহসৌন্দর্য্যে সেই বালারুণরাগরঞ্জিত স্রোতস্বিনীর শোভা যেন শতগুণ বর্দ্ধিত দেখাইতেছিল। ভাগীরথীর সুবিস্তীর্ণ পুণ্যতটে সেই একই প্রভাতে কত অসংখ্য সুন্দরীর একত্র সমাবেশ হইয়াছিল, সারি সারি কত সম্ভ্রান্ত গৃহের চারুনয়না রমণী অপ্সরা কিন্নরীর মত দেখাইতেছিলেন, কিন্তু কৈ, ভাগ্যবান্ গৌতমের প্রিয়তমার সঙ্গে ত তাহাদের এক জনেরও তুলনা হয় না। গঙ্গার শুভ্র স্রোতোজলে

ভাসমান বিচিত্রবর্ণ ফুলরাশির মধ্যে কুসুম-সুকুমারী অর্গল-রাজলক্ষ্মীকে যেন যথার্থই দেববালা বলিয়া বোধ হইতেছিল। তখন ক্রমে তিনি সেখানকার অনেকেরই আলোচনার বিষয় হইলেন। অদ্যকার স্নানের ঘাটে সুন্দরী সহচরীবেষ্টিতা কে এই অলোকসামান্যা রমণী? জানিবার জন্য সেখানে তাঁহাদের অজ্ঞাতসারে বিলক্ষণ গোপন অনুসন্ধান ও আন্দোলন উপস্থিত হইল। এ কথা কেবল নদীতীরেই আবদ্ধ থাকিল না—ক্রমে শত্রুপক্ষেরও কর্ণগোচর হইল।

রাণী যেখানে স্নান করিতেছিলেন, সে বিখ্যাত বন্ধার ঘাট। তাহার অনতিদূরে পরাজিত মুসলমান সেনাপতির শিবির সন্নিবেশিত ছিল। তিনিও এ সংবাদ মনোযোগের সহিত শুনিলেন। কিন্তু যখন তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরদের নিকটে নদীতীরের সেই রাজচিহ্নিত সুন্দরী রমণীর যথার্থ পরিচয় কিছুই জানিতে পারিলেন না, তখন সেই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য আপন কন্যাদ্বয়কে যথেষ্ট সতর্কতার সহিত স্নানের ঘাটে পাঠাইলেন। সেনাপতি-দুহিতা দুই ভগ্নী সম্রান্ত হিন্দু মহিলার বেশে যেন যথার্থই গঙ্গাস্নান-বাসনায় যেখানে রাণী স্নান করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন। রাজরাণী ও সেনাপতি-দুহিতা ইহাঁদের পরস্পরের পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত হইল। বিস্মিতা মুসলমান-কন্যা অপরিচিত হিন্দুরমণীর দেবদুর্লভ শ্রী আপন নয়নে প্রত্যক্ষ করিলেন। অসন্দিগ্ধমনা, সরলহৃদয়া রাণী গঙ্গাস্নানে দুইটী বিদেশী সহযোগিনী লাভে পরম সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। ক্রমে তাঁহাদের মধ্যে আলাপ চলিতে লাগিল। ক্রমে সেই দুইটী কৌতুকহাস্য-পরায়ণা পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তিরূপিণী সহযোগিনীর সরল ব্যবহারে মুগ্ধা রাণী বুঝি ক্ষণেকের জন্য সব ভুলিলেন,—বুঝি আপনার অজ্ঞাতসারে কোন্ অলক্ষ্য মুহূর্ত্তে অর্গলের কথা উল্লিখিত হইল, তিনি জানিতেও পারিলেন না। মুসলমানকন্যাদ্বয়ের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। তখন ত্বরিত স্নানান্তে তাঁহারা রাণীর নিকট আপ্যায়িত সম্ভাষণের সহিত বিদায় লইলেন—রাণীও অনতিবিলম্বে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন জন্য প্রস্তুত হইলেন। এ দিকে সেনাপতির কোনও কথাই অবিদিত রহিল না। নীচ প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি-বশে তিনি উত্তেজিত হইলেন। অর্গলরাজের হস্তে তিনি যে অচিন্তাপূর্ব্ব পরাজয়ে হতমান হইয়াছেন, স্মরণীয় সমরক্ষেত্রে অর্গলরাজের দ্বারা যে মুসলমান-গৌরবের বিদ্যুদুজ্জ্বল জগজ্জ্যোতি শোচনীয়রূপে মলিন হইয়াছে, নিদারুণ অশুভমুহূর্ত্তে অর্গলরাজের হস্তে যে দশ সহস্র মুসলমানসন্তান বৃথা প্রাণত্যাগ করিয়াছে, সেই কথা আজ সেনাপতির মর্ম্মান্তিক বোধ হইতেছিল। পরম শত্রু অর্গলের রাণী আজ ছদ্মবেশে মুসলমান অধিকারের মধ্যে—এ সুযোগ তিনি হেলায় হারাইতে চাহিলেন না। আত্মহারা সেনাপতি স্থানাস্থান

ভুলিলেন, স্ত্রী পুরুষের পার্থক্য ভুলিলেন, রণনীতি বিসর্জ্জন দিলেন, দিল্লীরও গৌরব বিস্মৃত হইলেন। অসহায়া রাজ-রাণীকে বন্দিনী করিতে তৎক্ষণাৎ আজ্ঞা প্রচার করিলেন। রাজা গৌতমের পবিত্র কুলে কলঙ্ক অর্পণে তিনি পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছা করিলেন;—অহংকৃত অর্গলরাজের সুন্দরী অঙ্কলক্ষ্মীকে প্রভু দিল্লীশ্বরের বিলাস-লালসাসেবার কিঙ্করীরূপে দেখিবেন, ইহাই তাঁহার পণ হইল।

বিধির এমনি নির্ব্বন্ধ! অর্গলের প্রাণের প্রাণ, উৎসাহের উৎস, আনন্দ-দায়িনী, প্রাণাধিক রাজলক্ষ্মী আপন গৃহ হইতে দূর দূরান্তরে বন্ধুহীন বিদেশে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় প্রবল শত্রুর বেষ্টিত জালে আবদ্ধা হইলেন।

গঙ্গাস্নানান্তে গৃহগমনোদ্যতা, নববস্ত্র-পরিহিতা রাণী প্রিয় সহচরীদের সহিত যখন নদীতীরের অনতিদূরে রাজপথে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন সহসা আপন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। চকিতের মধ্যে তিনি দেখিলেন, সারির পর সারি, দলের পর দল, সশস্ত্র মুসলমান সৈন্য-বৃতিকায় তাঁহার পথ রুদ্ধ! আরও দেখিলেন, সঙ্গে রক্ষক বলিতে কেহই নাই, পশ্চাতে, নদীতীরে শুধু নিরস্ত্র নিরীহ হিন্দুযাত্রিদল; কিন্তু সম্মুখে অগণিত শত্রুসেনা তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতেছে। তথায় নিরস্ত্র ও নিঃসহায় রমণীর প্রতি মুসলমান সৈন্যের এই নীচ আক্রমণের উদ্যমে রাণী ঘৃণা, রোষ ও লজ্জায় দন্তে অধর নিষ্পেষণ করিতে লাগিলেন। ক্রোধাবেগে তাঁহার শতদল-শুভ্র গণ্ডস্থল ও ললাটে সজোরে শোণিত সঞ্চালিত হইল, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় তিনি একবার পশ্চাতে, আর একবার সখীদের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার সে দৃষ্টিতে একাধারে নিদারুণ আত্মগ্লানি, অভিমান, ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ পাইতেছিল। এমন সময়ে কৃতপ্রতিজ্ঞ ক্রুদ্ধ মুসলমানসৈন্যের সমবেত জয়শব্দ শুনা গেল। তখনই রাজরাণীর অনতিদূরে একজন মুসলমান দলপতি চীৎকারস্বরে বলিতেছিল,—"সৈন্যগণ! ঐ যে! ঐ যে! তোমাদের সম্মুখে অর্গলের দুষ্টা রাণী! তোমরা সত্বর অগ্রসর হও, উহাকে ধর, অপমানিত কর, সেদিনকার উত্তম প্রতিশোধ আজ দাও। শত্রু অর্গলরাজের প্রাণ আজ তোমাদের হাতে, সেই পাপপ্রাণের বিনিময়ে দিল্লীর মান রক্ষা কর।" দল-পতির সেই কথায় সঙ্গে সঙ্গে সহস্র মুসল-মানকণ্ঠে বিকট জয়ধ্বনি উঠিল, অর্গল-রাজান্তঃপুরবাসিনীদের সম্মুখে, দক্ষিণে, বামে শত্রুহস্তে সূর্য্যকিরণ-প্রতিফলিত সহস্র শাণিত তরবারি উদ্যত হইল।

অপমানের আশঙ্কায় রাজরাণী আহত ফণিনীর মত ফিরিলেন। তাঁহার প্রায় চারি দিকেই শত্রুস্রোত, কেবল পশ্চাতে হিন্দুযাত্রিস্রোত। কিন্তু তাহারাও নিরীহ, নিরস্ত্র, স্নানার্থী বৈ আর কিছু নয়। তথাপি তখন সেই দিকে, সেই মুসলমান সৈন্যের সমবেত উল্লাসশব্দের মধ্যেও

ক্রোধোদ্দীপ্ত রাণীর তীব্র কণ্ঠস্বর শুনা গেল। যেন মুহূর্ত্তের জন্য শত্রুসেনার গতিরোধ হইল। রাণী উত্তেজিতকণ্ঠে বলিতেছিলেন,—"পরাজিত মুসলমান সেনাপতিকে ধিক্! মুসলমান সেনাকে ধিক্! দিল্লীর গৌরবেও ধিক! পরাজিত কাপুরুষের অধম, তাই নিরস্ত্র স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার ভিন্ন পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে অন্য উপায়ে অক্ষম। আমার সম্মুখে ইহারা সৈনিকপুরুষ না ফেরুপাল? সৈনিক হইলে ইহারা অর্গলের বীরপুরুষদের সম্মুখীন হইতে এত ভয় পায় কেন? আমরা আজ ইহাদেরই হাতে বন্দিনী হইব? অর্গলের গৌরবগর্ব্বিত বীররাজার পত্নী আজ ভীরু ধূর্ত্ত শৃগালের করস্পর্শে কলঙ্কিত হইবে? কখনই না। আমার পশ্চাতে আজ কি অর্গলের একটি বীরপুরুষও উপস্থিত নাই? গঙ্গাতীরে স্নানার্থী, হিন্দুযাত্রীদের মধ্যে কি আজ আমাদের রাজপুত ভাই এক জনও নাই, যাঁহার নিকট রাজপুত-রমণী প্রাণাপেক্ষা প্রিয়? এই বর্ব্বর শত্রুসেনার সম্মুখ হইতে আমরা কখনই পলাইব না। ইহারা আজ দেখুক অর্গলের রমণীরা আপনাদের গৌরবরক্ষা করিতে কেমন অম্লানমুখে প্রাণত্যাগ করিতে জানে!"

রাণীর মুখে এই উদ্দীপনাপূর্ণ কথা শেষ হইতে না হইতেই সকলে সবিস্ময়ে শুনিল অনতিদূরে, সমবেত পুরুষকণ্ঠে বজ্রগম্ভীরস্বরে ধ্বনিত হইল,—"রাণীজি কি জয়!"

(ক্রমশঃ)

শ্রীমান্ শরদিন্দু বিশ্বাসের সহিত শ্রীমতী চারুশীলা দত্তের শুভবিবাহের অনুষ্ঠান পদ্ধতি।

(২৪এ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, বঙ্গাব্দ ১৩০৫।)

ঈশ্বর-স্মরণ।

কন্যাকর্ত্তা বেদীর সম্মুখে বরকে উপবেশন করাইয়া সর্ব্বাগ্রে মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরকে স্মরণ করিবেন, যথা,

সেই পূর্ণমঙ্গল জগৎপ্রসবিতা পরমদেবতার সত্য সুন্দর মঙ্গলভাব ধ্যান করি, যিনি অদ্যকার শুভ অনুষ্ঠানের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ও কল্যাণফলবিধাতা হইয়া উপস্থিত রহিয়াছেন।

সভাস্থগণের অনুমতি গ্রহণ।

[কন্যাকর্ত্তা দণ্ডায়মান হইয়া সভাস্থগণকে সম্বোধনপূর্ব্বক]

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভোদ্বাহকর্ম্মণি পুণ্যাহং ভবন্তোঽবিব্রুবন্ত।

এই শুভবিবাহ কর্ম্মে আপনারা পুণ্যাহ বলুন্।

সভাস্থ সকলে—ওঁ পুণ্যাহং।

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভোদ্বাহকর্ম্মণি ঋদ্ধিং ভবন্তোধিক্রুবন্তু।

এই শুভবিবাহ কর্ম্মে আপনারা ঋদ্ধি বলুন্।

সভাস্থ সকলে—ওঁ ঋধ্যতাং।

ওঁ কর্ত্তব্যেঽস্মিন্ শুভোদ্বাহকর্ম্মণি স্বস্তি ভবন্তোধিক্রুবন্তু।

এই শুভবিবাহ কর্ম্মে আপনারা স্বস্তি বলুন্।

সভাস্থ সকলে—ওঁ স্বস্তি।

পাত্রের বরণ।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ ইদমর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্যতাম্।

এই অর্ঘ্য গ্রহণ করুন্।

বর—অর্ঘ্যং প্রতিগৃহ্লামি।

অর্ঘ্য গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ এষঃ পরিচ্ছদঃ প্রতিগৃহ্যতাম্।

এই পরিচ্ছদ গ্রহণ করুন্।

বর—প্রতিগৃহ্লামি।

গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ ইদং অঙ্গুরীয়ং প্রতিগৃহ্যতাম্।

এই অঙ্গুরীয় গ্রহণ করুন্।

বর—প্রতিগৃহ্লামি।

গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ তৎসদদ্য বিংশাধিকাষ্টাদশশততম শকাব্দে মার্গশীর্ষে মাসি চতুর্ব্বিংশ দিবসে বৃশ্চিকরাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষে একাদশ্যাং তিথৌ শুক্রবাসরে কাশ্যপগোত্রস্য স্বর্গগতস্য রামহরি বিশ্বাসস্য প্রপৌত্রং, স্বর্গগতস্য গৌরমোহন বিশ্বাসস্য পৌত্রং, স্বর্গগতস্য প্যারীমোহন বিশ্বাসস্য পুত্রং, কাশ্যপগোত্রং শ্রীশরদিন্দু বিশ্বাসং কাশ্যপগোত্রস্য স্বর্গগতস্য ষষ্ঠীচরণ দত্তস্য প্রপৌত্র্যাঃ, স্বর্গগতস্য হরমোহন দত্তস্য পৌত্র্যাঃ, শ্রীউমেশচন্দ্র দত্তস্য পুত্র্যাঃ কাশ্যপগোত্রায়াঃ চারুশীলা দত্তজায়াঃ কন্যায়াঃ শুভোদ্বাহকর্ম্মণি এভিরুপকরণাদিভিরভ্যর্চ্চ্য বরত্বেন ভবন্তমহং বৃণে।

বর—ওঁ বৃতোঽস্মি।

বৃত হইলাম।

অনন্তর বর অন্তঃপুরে নীত ও নারীগণ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইবেন।

ব্রহ্মোপাসনা।

বর কন্যার সহিত সভাস্থলে প্রত্যাগত হইলে কন্যাকর্ত্তা বেদীর অভিমুখীন হইয়া বসিবেন এবং কন্যা ও বরকে পরস্পরের সম্মুখীন করিয়া আপনার দুই পার্শ্বে বসাইবেন। অনন্তর আচার্য্যকর্ত্তৃক সাধারণ ব্রহ্মোপাসনা হইবে। উপাসনার পর

কন্যাকর্ত্তা—(কন্যার প্রতি) তব বিবাহার্থং যথাবিধি অর্চ্চিতং ইমং সদ্গুণান্বিতং ব্রহ্মনিষ্ঠং বরং সাদরং পতিত্বেন বৃণুষ।

তোমার বিবাহার্থ যথাবিধি অর্চ্চিত সদ্গুণান্বিত ব্রহ্মনিষ্ঠ এই বরকে তুমি সাদরে পতিত্বে বরণ কর।

কন্যা—সাদরং বৃণোমি।

সাদরে বরণ্ড্কিরিলাম।

কন্যা সম্প্রদান।

কন্যাকর্ত্তা—(বর ও কন্যার দক্ষিণ হস্ত স্বহস্তোপরি লইয়া)—ওঁ তৎসদদ্য বিংশাধিকাষ্টাদশশততমশকাব্দে মার্গশীর্ষে-মাসি চতুর্ব্বিংশদিবসে মেষরাশিস্থে ভাস্করে কৃষ্ণপক্ষে একাদশ্যাং তিথৌ কাশ্যপগোত্রঃ শ্রীউমেশচন্দ্র দত্তঃ ঈশ্বর-প্রীতিকামঃ কাশ্যপ-গোত্রস্য স্বর্গগতস্য রামহরি বিশ্বাসস্য প্রপৌত্রায়, স্বর্গগতস্য গৌরমোহন বিশ্বাসস্য পৌত্রায়, স্বর্গগতস্য প্যারীমোহন বিশ্বাসস্য পুত্রায় কাশ্যপ-গোত্রায় শ্রীশরদিন্দু বিশ্বাসায় বরায় ব্রহ্মনিষ্ঠায় ব্রাহ্মায় যথাবিধি অর্চ্চিতায় কাশ্যপগোত্রস্য স্বর্গতস্য ষষ্ঠীচরণ দত্তস্য প্রপৌত্রীং, স্বর্গগতস্য হরমোহন দত্তস্য পৌত্রীং, শ্রীউমেশচন্দ্র দত্তস্য পুত্রীং কাশ্যপগোত্রাং সুশীলাং সালঙ্কারাং বাসসাচ্ছাদিতাং শ্রীমতীং চারুশীলা-দত্তাং ইমাং কন্যাং তুভ্যমহং সম্প্রদদে *

বর—কন্যামিমাং সাদরমহং গৃহ্ণামি।

আমি এই কন্যাকে পবিত্র উদ্বাহ-যোগের জন্য সাদরে গ্রহণ করিলাম।

কন্যাকর্ত্তা—(বর ও কন্যার হস্ত পুষ্পমালা দ্বারা বন্ধন করিয়া দিয়া)

বরের প্রতি—ধর্ম্মে চ অর্থে চ জ্ঞানে চ ভোগে চ নাতিচরিতব্যা ত্বয়েয়ং।

ধর্ম্মে, অর্থে, জ্ঞানে, ও ভোগে তুমি ইহাকে অতিক্রম করিবে না।

বর—নাতিচরিষ্যামি।

অতিক্রম করিব না।

কন্যার প্রতি—ধর্ম্মে চ অর্থে চ জ্ঞানে চ ভোগে চ নাতিচরিতব্যস্ত্বয়ায়ং।

ধর্ম্মে, অর্থে, জ্ঞানে ও ভোগে তুমিও ইহাকে অতিক্রম করিবে না।

কন্যা—নাতিচরিষ্যামি।

অতিক্রম করিব না।

কন্যাকর্ত্তা—(বর ও কন্যা উভয়ের প্রতি)—"সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মং ব্রহ্মসাৎকৃতমানসৌ।"

তোমরা উভয়ে পরব্রহ্মে মনঃ প্রাণ সমাধান করিয়া এক সঙ্গে অভিন্নভাবে ধর্ম্মাচরণ কর।

কন্যাকর্ত্তা—ওঁ, ব্রহ্মার্পণমস্তু। স্বস্তি স্বস্তি স্বস্তি।

উদ্বাহ প্রতিজ্ঞা।

বর—অদ্য আমি শ্রীশরদিন্দু বিশ্বাস সর্ব্বসাক্ষী পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরকে ও সমাগত ধর্ম্মবন্ধুগণকে সাক্ষী করিয়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক স্বচ্ছন্দচিত্তে তোমাকে আমার বৈধপত্নীরূপে গ্রহণ করিলাম। সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সুস্থতায় অসুস্থতায় তোমার মঙ্গল সাধনে ও তোমার প্রতি সৎপতির কর্ত্তব্য পালনে আমি যাবজ্জীবন যত্নবান্ থাকিব।

কন্যা—অদ্য আমি শ্রীচারুশীলা দত্ত সর্ব্বসাক্ষী পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরকে ও সমাগত ধর্ম্মবন্ধুগণকে সাক্ষী করিয়া

* সম্প্রদানের প্রকৃত অর্থ—"সহোভৌ চরতাং ধর্ম্মং"—উভয়ে একত্র হইয়া ধর্ম্মাচরণ কর এই কথা বলিয়া বিবাহার্থ কন্যাকে বরের হস্তে অর্পণ করা। সামান্য তৈজসপাত্র বা গো অশ্ব দানের ন্যায় এ দান যথেচ্ছাচারিতার জন্য নহে।

স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ও স্বচ্ছন্দচিত্তে তোমাকে আমার বৈধপতিরূপে গ্রহণ করিলাম। সম্পদে বিপদে, সুখে দুঃখে, সুস্থতায় অসুস্থতায়; তোমার মঙ্গলসাধনে ও তোমার প্রতি সৎপত্নীর কর্ত্তব্যপালনে যাবজ্জীবন যত্নবতী থাকিব।

অতঃপর গ্রন্থি বন্ধন হইবে।

ভর্ত্তা ও বধূ—

ওঁ বধ্নামি সত্যগ্রন্থিনা মনশ্চ হৃদয়ঞ্চ তে।
যদেতদ্ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব।
যদেতদ্ হৃদয়ং তব তদস্তু হৃদয়ং মম।
আবয়োর্হৃদয়ং যত্তু তদস্তু ব্রহ্মণঃ সদা।

আমি সত্যগ্রন্থি দ্বারা তোমার মন ও হৃদয় বন্ধন করি। আমার যে হৃদয়, তাহা তোমার হউক; তোমার যে হৃদয়, তাহা আমার হউক এবং আমাদের উভয়ের হৃদয়, সর্ব্বদা ঈশ্বরের হউক।

মালা ও অঙ্গুরীয় বিনিময়।

ভর্ত্তা ও বধূ—"ওঁ প্রাণৈস্তে প্রাণান্ সন্দধামি, অস্থিভিরস্থীনি মাংসৈর্মাংসানি, ত্বচা ত্বচং।"

আমার প্রাণের সহিত তোমার প্রাণ সংযুক্ত করিতেছি। অস্থি দ্বারা অস্থি, মাংস দ্বারা মাংস এবং ত্বগিন্দ্রিয় দ্বারা ত্বগিন্দ্রিয় সংযুক্ত করিতেছি।

ভর্ত্তা (বধূর প্রতি)—ওঁ অঘোরচক্ষুরপতিঘ্ন্যেধি শিবা পশুভ্যঃ সুমনাঃ সুবর্চ্চাঃ।"

তোমার চক্ষু প্রসন্ন হউক। তুমি পতির হিতকারিণী হও, পতির প্রতিকূলাচারিণী হইও না। জীবগণের প্রতি কল্যাণদায়িনী হও। তোমার মন সুন্দর হউক। তুমি তেজস্বিনী হও।

"ওঁ সাম্রাজ্ঞী শ্বশুরে ভব সাম্রাজ্ঞী শ্বশ্র্বাং ভব ননান্দরি চ সাম্রাজ্ঞী, সাম্রাজ্ঞী অধিদেবৃষু দ্বিপদে বা চতুষ্পদে।"

শ্বশুর, শাশুড়ী, ননন্দা ও দেবরগণ এবং গৃহস্থ পশুপক্ষীর উপর তুমি শোভমানা হইয়া প্রেমের সাম্রাজ্য বিস্তার কর।

"ওঁ ধ্রুবা দ্যৌ ধ্রুবা পৃথিবী ধ্রুবং বিশ্বমিদং জগৎ; ধ্রুবাসঃ পর্ব্বতা ইমে ধ্রুবং পতিকূলে ইয়ং।"

দ্যুলোক যেমন ধ্রুব, পৃথিবী যেমন ধ্রুব, এই সমস্ত জগৎ যেমন ধ্রুব, এই সকল পর্ব্বত যেমন ধ্রুব—সেইরূপ এই স্ত্রী পতিকুলে ধ্রুব হইয়া থাকুন।

ভর্ত্তা ও বধূ উভয়ে—

"ওঁ সমঞ্জন্তু বিশ্বেদেবঃ সমাপো
হৃদয়ানি নৌ।"

বিশ্বপতি আমাদের উভয়ের হৃদয় সংযুক্ত করুন্।

ওঁ সুগঃ নু পন্থাঃ প্রদিশন্ন এহি জ্যোতিষ্মধ্যে হ্যজরন্ন আয়ুঃ।"

"অপৈতু মৃত্যুরমৃতং ন আগাদ্বৈবস্বতো
নোঽভয়ং কৃণোতু নঃ।"

হে জ্যোতির জ্যোতিঃ পরমাত্মন্! এস, আমাদের পথ দেখাও, যে পথে আমরা সুখে গমন করিতে পারি, যে পথে চলিলে আমরা মৃত্যুকে পরিহার করিয়া অমৃত লাভ করিতে পারি, সেই পথ আমাদিগকে দেখাও, আমাদিগকে অভয় প্রদান কর।

(অনন্তর কন্যাকর্ত্তা ও আচার্য্যের উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ)।

সপ্তপদী গমন।

অতঃপর উদ্বাহস্থান হইতে বাসগৃহে গমনের পথে প্রদত্ত সাতখানি আসনে ক্রমান্বয়ে পদ নিক্ষেপ করিতে করিতে ভর্ত্তা ও বধূ এইরূপে প্রার্থনা করিবেন; যথা—

(১) ঈশ্বরলাভের নিমিত্ত আমরা প্রথম পদ নিক্ষেপ করি এবং উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

(২) সংসার-ধর্ম্মপালনে বললাভের নিমিত্ত আমরা দ্বিতীয় পদ নিক্ষেপ করি এবং উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

(৩) পবিত্র দাম্পত্য ব্রত সাধনের নিমিত্ত আমরা তৃতীয় পদ নিক্ষেপ করি এবং উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

(৪) জনসমাজের হিতসাধনের নিমিত্ত আমরা চতুর্থ পদ নিক্ষেপ করি এবং উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

(৫) সকল জীবের কল্যাণ সাধনের জন্য আমরা পঞ্চম পদ নিক্ষেপ করি এবং উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

(৬) শীত বসন্ত প্রভৃতি ছয় ঋতুতে ধর্ম্মসাধনের আনুকূল্য কামনায় আমরা ষষ্ঠ পদ নিক্ষেপ করি এবং উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

(৭) সত্য লাভের নিমিত্ত আমরা সপ্তম পদে আরোহণ করি; ব্রহ্ম আমাদিগকে সর্ব্বোপরি সত্যলোকে লইয়া যাউন। আমরা উভয়ে উভয়ের অনুব্রত হই।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ হরিঃ ওঁ।

যৌতুক।

(স্নেহের ভগিনী চারুশীলার শুভবিবাহে)

১

মা বাপের সোহাগের বালিকা সরলা,
পবিত্রতা-মাখা মুখ
প্রভাতী মল্লিকাটুক!
লজ্জাবতী লতা যেন লাজে ঢল ঢল!
প্রিয় বোন চারুশীলে,
কি আজি তোমারে দিলে,
পূরিবে আমার সাধ—নাহি যায় বলা,
কি দিব "যৌতুক" আজি মন-প্রাণ-গলা?

২

তব এ গরীব "দিদি" কি দিবে তোমায়?—
পারি নাতো এক বিন্দু
পাড়িয়া শরত-ইন্দু,
হীরার মুকুটরূপে, পরা'তে মাথায়!
পারি না তারার ঝাড়
গলে দিতে—গেঁথে হার,
পারি না মাখাতে দেহে পারিজাত-বা'য়!—
কিসে তবে হব সুখী, কি দিব তোমায়?

৩

তবে
প্রাণের আশীষ সহ স্নেহের আদর,
দিতেছি খুলিয়া হৃদি,
হাসি মুখে লহ দিদি!
আনন্দে ভরিয়া যা'ক ভগিনী-অন্তর।
বিভু-পদে মতি রাখ,
চির দিন সুখে থাক,
তুমি হও সীতা সতী, রাম হোন বর;
এয়োতী সাবিত্রী-সমা,
সোহাগিনী স্বাহা, রমা,
দুজনে একত্র লভি সুখে কর ঘর;
এই ভিক্ষা দিন বিধি মঙ্গল-আকর।

৪

সুপবিত্র গৃহাশ্রম দেবতার স্থল,
দেব, সাধু, গুরুভক্তি,
পূত কাজে অনুরক্তি—
ছোট বড়, আত্ম পর, সবারি মঙ্গল;
উচ্চ সাধ উচ্চ আশ,
উচ্চ লক্ষ্যে ভালবাসা,
দম্পতীর এক হিয়া—বিশ্বাস প্রবল,
যেথা হয়, সেথা "শুভ বিবাহ" সফল।

৫

হীনতা নীচতা সব দলিয়া চরণে
বিধাতার স্নেহাশীষ,
প্রাণে পেয়ে অহর্নিশ,
"সহধর্ম্মিণী"র নাম রেখ প্রাণপণে।
পতি জ্ঞান নারী ভক্তি,
মিলিত সে শিব শক্তি,
উভয়ের এক যোগ সংসার-পালনে।
নারীর দেবতা পতি,
সাহস, সহায়, গতি,
সার্থক রমণীজন্ম সে পদ সেবনে;
পতি যদি পথ ভুলে,
জায়া লবে পুনঃ তুলে,
জপিবে তাঁহারি নাম নিদ্রা জাগরণে,
শাস্ত্র-উপদেশ এই, রেখ বোন, মনে।

৬

জগতের যাহা কিছু আপদ বালাই,
হয়ে যাক্ শত দূর—
তোমাদের গৃহ-পুর,
হউক আনন্দ-ধাম, এই বর চাই।
সুখী হও সত্য সুখে,
পূত-হাসি থাক্ মুখে,
থাক্ আনন্দের উষা পরাণে সদাই,
জগৎ দেখুক চেয়ে
জননীর যোগ্যা মেয়ে!
তেমনি সৌভাগ্য হ'লে আর কিবা চাই?
কও বোন চারুশীলে!
কেমন "যৌতুক" নিলে?—
আর হেথা কিবা মিলে, ভাবিতেছি তাই—
ধর এই উপহার সুখে ভেসে যাই।

২৪ অগ্রহায়ণ, শুক্রবার, ১৩০৫ সাল। — শুভাকাঙ্ক্ষিণী সেই দিদি।

বাদসাহী রহস্য।

আমরা বাঙ্গালী,—বাঙ্গালী হইয়া বাদসাহী রহস্যের কথা যতটুকু জানা সম্ভব, আমরা তাহাই জানি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গোপালের রহস্যের কথাই আমাদের বিদিত; তাহাও কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, জানিবার উপায় নাই। অনেকেই অনেক রহস্য রচিয়া গোপালের নামে চালাইয়া দিয়াছেন। যাহাহউক, কৃষ্ণচন্দ্র ও গোপালের রহস্য পরিহাসই, বাঙ্গালীর কাছে বাদসাহী রহস্য।

কৃষ্ণচন্দ্রের গোপালের আদর্শ হিন্দুরাজগণের বিদূষকে পাওয়া যায়। হিন্দুরাজগণ মনোরঞ্জনের জন্য সভায় বিদূষক রাখিতেন, রহস্য পরিহাসে, রাজার চিত্ত-তুষ্টি করাই বিদূষকের কার্য্য ছিল; কিন্তু বিদূষক শুধু "ভাঁড়" নহে, অনেক সময় তিনি রাজার প্রধান অন্তরঙ্গ বয়স্য, অন্যের অজ্ঞেয় রাজার গোপনীয় সুখ দুঃখের কথা তিনি ভিন্ন আর কেহই জানিতেন না। যাঁহারা সংস্কৃত অভিজ্ঞান শকুন্তল ও রত্নাবলী পড়িয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন যে, বিদূষকগণ রাজার কতদূর বিশ্বাস্ ও স্নেহের পাত্র ছিলেন।

মুসলমান মোগল বাদসাহগণ বিদূষক-শ্রেণীর লোক রাখিতেন কি না, তাহার বিশেষ বিবরণ জানি না; তবে তাঁহারা যে রহস্যপ্রিয় ছিলেন, তাহার পরিচয় আজিও অনেকটা পাওয়া যায়। কেবল জনশ্রুতি প্রসঙ্গে নহে, ইউরোপীয় পর্য্যটকগণ বাদসাহী রহস্যের কথা কিছু কিছু লিখিয়া গিয়াছেন, পাঠককে তাহারই দুই একটা উপহার দিতেছি।

দিল্লীশ্বর মোগল বাদসাহগণের সভায় অনেক বিদেশী দূত আসিতেন। তাতার, আরব, তুর্কীস্থান, মিশর হইতে কত দূত আসিত। কত ইংরাজ, ফরাসী, ওলন্দাজ, পর্টুগীজ, কত বহুমূল্য বিচিত্র উপহার লইয়া সম্রাটের কৃপাকটাক্ষ ভিক্ষা করিয়া কক্ষায় কক্ষায় দাঁড়াইয়া থাকিতেন, সম্রাটের সিংহাসনতলে ভূমি চুম্বন করিয়া কুর্ণিস করিতে পাইলে আপনাদিগকে সম্মানিত মনে করিতেন। যাউক, এ সব কথায় বৃথা প্রবন্ধ-কলেবর বাড়াইবার ইচ্ছা নাই।

দিল্লীশ্বরের সভায় সমাগত দূতগণের মধ্যে পারস্যজাতির দূতগণ কিছু অধিক সম্মান পাইতেন, অনেকটা স্বাধীনতাও ভোগ করিতেন। পারস্যজাতির সম্মানলাভার জন্য দিল্লীর বাদসাহকে অনেক সময় পারস্য দূতগণের অনেক তীব্র কথাও সহ্য করিতে হইত। অন্যান্য বাদসাহের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং আরংজেবও অনেক সময় ক্রোধে ফুলিয়া নীরব হইয়া থাকিতেন। তবে সাহজাহান বড় সহিতে পারিতেন না।

একবার সম্রাট্ সাহজাহানের নিকট পারস্যরাজ শাহ আব্বাসের এক দূত আসিয়াছিলেন। দূতপ্রবর বড় রুক্ষ-স্বভাব, মহাদর্পী। দূত বাদসাহের সহিত সমান সমান ব্যবহার করিতেন, রাজ-সাক্ষাৎকারকালে অথবা অন্য সময় ভুলিয়াও কখনও তসলীম করিতেন না —মাথা নোয়াইতেন না। দেখিয়া দেখিয়া সাহাজাহান অন্তরে অন্তরে জলিলেন, জলিয়া এক কৌশল করিলেন।

একদিন দূতকে সংবাদ দিলেন যে, নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমখাসে বাদসাহ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। দূত আসিলেন, আসিয়া দেখিলেন যে, আমখাসের ফটক বন্ধ, কেবল তাহার গাত্রসংলগ্ন একটী অতি ছোট দ্বার খোলা আছে, সে দ্বার এত ক্ষুদ্র যে, প্রবেশ করিতে হইলে মস্তক অবনত না করিয়া প্রবেশ করা অসম্ভব। বাদসাহ ভাবিয়াছিলেন যে, এই সুযোগে অন্ততঃ প্রকারান্তরে দূতের গর্ব্ব খর্ব্ব করিবেন, তাই এ কৌশল। দূত কিন্তু বড়ই দাম্ভিক, বড়ই ধূর্ত্ত— তিনি বাদসাহের দিকে পিছন করিয়া সেই ছোট দ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

সাহজাহান ক্রোধভরে বলিলেন—"আঃ হতভাগ্য! তুমি কি মনে করিয়াছিলে যে, তোমার মত গর্দ্দভের পায়শালে প্রবেশ করিতেছ, তাই এরূপ করিলে?" দূত অম্লানবদনে বলিলেন, "তাই মনে করিয়াছিলাম বই কি; এত ছোট দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে হইলে কে মনে করে যে, সে গর্দ্দভ ভিন্ন আর কাহারও সহিত দেখা করিতে যাইতেছে?"

আর এক দিন পারস্যদূতের কঠোর কথায় রুষ্ট হইয়া সাহজাহান বলিয়াছিলেন, "সাহ আব্বাসের সভায় কি কোন ভদ্রলোক ছিলেন না, তাই তিনি তোমার মত নির্ব্বোধকে এখানে পাঠাইয়াছেন?" দূত বলিলেন, "থাকিবে না কেন? শত শত সম্ভ্রান্ত লোক আছেন, কিন্তু যেমন বাদসাহের কাছে আসিতে হইবে, তেমনই দূত পাঠাইয়াছেন।"

আর এক দিন সাহজাহান পারস্য দূতকে আহারের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। উভয়ে আহার করিতেছেন, সাহজাহান দূতকে কেবল বিরক্ত ও অপদস্থ করিবার অবসর প্রতীক্ষা করিতেছেন। দেখিলেন যে, দূতপ্রবর ব্যঞ্জনের অস্থিখণ্ডগুলি উত্তমরূপে চুষিয়া চুষিয়া পরিত্যাগ করিতেছেন; ধীরভাবে হাসিয়া বলিলেন "এলবিনী (দূত প্রবর) কুকুরে খাইবে কি?" দূতপ্রবর বলিলেন "খিচুড়ী।" বলা বাহুল্য যে, সাহজাহান বড় খিচুড়ী-প্রিয় ছিলেন, এবং ঐ সময় ঐ দ্রব্য অতি সন্তোষের সহিত ভোজন করিতেছিলেন।

ইহার পর অন্য এক সময় সাহজাহান সরলভাবে হিন্দুস্থানের মোগল বাদসাহ ও পারস্য জাতির ক্ষমতা বিবৃত করিয়া দূতকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বলুন্ দেখি কে বড়?" তাহাতে দূত বলিয়াছিলেন

"ভারতবর্ষে মোগলের ক্ষমতা ঐশ্বর্য্য পূর্ণচন্দ্রের সহিত তুলনার যোগ্য, আর পারস্যের প্রতাপ দুই তিন দিনের নব শশি-কলার মত।" অবশ্য সাহজাহান এ প্রীতিপূর্ণ উত্তরে বড় সুখী হইলেন; কিন্তু পরে যখন দূতপ্রবরের বাক্যের প্রকৃত অর্থ বুঝিলেন, তখন অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন—বুঝিলেন যে, দূতের কথার উদ্দেশ্য,—মোগলের সুখৈশ্বর্য্য প্রতাপ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় সম্পূর্ণ হইয়াছে, এক্ষণে ক্ষয়োন্মুখ; আর পারস্যের প্রভাব নবকল চন্দ্রের ন্যায় নিত্য বাড়িতেছে।

যাহা হউক, দূতপ্রবর শেষে এতদূর বাড়াবাড়ি করিয়াছিলেন যে, নিতান্ত মানে মানে দেশে ফিরিতে পারেন নাই। ইটটী মারিয়া কিছু বড় রকম পাটকেল খাইতে হইয়াছিল। দিল্লীতে যে দেহ রাখিয়া যাইতে হয় নাই, ইহাই তাঁহার পরম ভাগ্য। সাহজাহান শেষে দূতের ব্যবহারে একান্ত বিরক্ত হইয়া গোপনে তাঁহার প্রাণবধের কল্পনা করিলেন,—পথিমধ্যে অকস্মাৎ মত্ত হস্তিপদে দলন করাই তাঁহার অভিপ্রেত হইল। সে অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত করিতে গোপনে বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে আদেশও দিলেন। দরবার-গৃহে যাইতে হইলে দূতপ্রবরকে এক অপ্রশস্ত পথ দিয়া যাইতে হইত। এক দিন পাল্‌কী করিয়া সেই পথ দিয়া যাইতেছেন, হঠাৎ তাহার দিকে এক হস্তী ছুটিয়া আসিল। তখন তিনি পাল্‌কী হইতে লাফাইয়া পড়িয়া সঙ্গী বাহকগণের সহিত একযোগে হস্তীর প্রতি এরূপ সত্বর তীক্ষ্ণ শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন যে, হস্তী আহত হইয়া ফিরিয়া পলাইল। যাহা হউক, দূতবর শেষে প্রাণ লইয়া দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। হিন্দুস্থানে দিল্লীর দরবারে পুনরায় আসিয়াছিলেন কি না, সে কথা জানা নাই।

প্রেরিত পত্র।

বাঙ্গালীর গৌরব।

আনন্দের সহিত আপনাকে জানাইতেছি যে, রাজপুতানা যোধপুর রাজ্যে অদ্য ১৭ বৎসর যাবৎ কলিকাতা কুমারটুলী-নিবাসী ৺অপূর্ব্ব ডাক্তারের পুত্র, ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ গুপ্ত মহারাজা বাহাদুরের গৃহ-চিকিৎসকরূপে নিযুক্ত আছেন। স্বর্গীয় মহারাজা যশোবন্ত সিংহ বাহাদুর ইঁহার চিকিৎসার বিশেষ সুখ্যাতি করিতেন। বাল্যে উপস্থিত মহারাজাধিরাজ সর্দার্ সিংহ বাহাদুর

ইঁহার সুচিকিৎসায় নানারূপ কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। মহারাজাধিরাজের খুল্লতাত, যোধপুর রাজ্যের প্রধান সচিব মহারাজ কর্ণেল সার প্রতাপ সিংহ বাহাদুর জি, সি, এস, আই, এবং অন্যান্য বড় বড় ঠাকুর প্রভৃতি সকলেই প্রিয়নাথ বাবুর সুচিকিৎসার বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন।

সম্প্রতি যশের পুরস্কারস্বরূপ যাহা রাজপুতানায় অত্যন্ত সম্মানের চিহ্ন এবং জয়পুর রাজ্যের মন্ত্রী শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু কান্তিচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্যতীত যাহা দ্বিতীয় বাঙ্গালীর ভাগ্যে হয় নাই, সেই সম্মানে সম্মানিত করিয়া মহারাজাধিরাজ সর্দার সিংহ বাহাদুর প্রিয়নাথ বাবুর পায়ে "তাজিম কা সোণা" দিয়াছেন, অর্থাৎ সোণার মল পরাইয়া দিয়াছেন।

ইহা পায়ে থাকিলে, প্রিয়নাথ বাবু রাজসমীপে উপস্থিত হইলে মহারাজাধিরাজ বাহাদুর যদ্যপি সিংহাসনে বসিয়া থাকেন, তো তাহা ত্যাগ করিয়া উঠিয়া সম্ভাষণ করিবেন, এবং দৈবক্রমে যদি অন্য দেশের রাজাও সেই স্থানে উপস্থিত থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকেও উপরি-উক্তরূপ সম্ভাষণ করিতে হইবে।

এ সম্মান বাঙ্গালীর মধ্যে কয় জনের ভাগ্যে ঘটে? ইহা বাঙ্গালীর গৌরব করিবার বিষয় নহে কি? বলা বাহুল্য, এ সংবাদে রাজপুতানার সমস্ত বাঙ্গালীই বিশেষ প্রীত হইয়াছেন এবং মনে মনে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বোধ করিয়াছেন। আশা করি, আপনি আপনার বহুবিস্তৃত সংবাদপত্রে ইহা প্রচার করিয়া সমস্ত বাঙ্গালী-সমাজকে গৌরবান্বিত করিবেন।

তাজিমের সোণা পাইলে বাৎসরিক অন্ততঃ ৬০০০ ছয় হাজার টাকা আয়ের একখানি জায়গীর উপহার পাওয়া যায়, আশা আছে, সে বিষয়েও প্রিয়নাথ বাবু বঞ্চিত হইবেন না।

শ্রীহরিগোপাল গুপ্ত।

মার কাছে যাওয়া হ'ল না।

(১)

সন্ধ্যা হইয়াছে। নীল নভঃস্থলে অসংখ্য নক্ষত্ররাজি শ্যামল তৃণাবৃত প্রান্তরে প্রস্ফুটিত কুসুমনিচয়ের ন্যায় মনোরম শোভা ধারণ করিয়াছে, প্রফুল্ল-কুসুম-গন্ধ মাখিয়া সমীরণ মৃদুমন্দগমনে জগৎ পুলকিত করিতেছে, পক্ষিগণের কলরব, সায়ংকালোচিত পুরনারীগণের মঙ্গল শঙ্খ-ধ্বনি এখনও সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ হয় নাই। এই সময়ে হরেন্দ্র তাহার দিদি সরলার কোলে বসিয়া প্রাণ খুলিয়া কত কথা কহিতেছে। অনেক দিন দিদিকে দেখে

নাই, অনেক দিন তাহার কোলে বসে নাই, তাহার সহিত কথা কহিতে পায় নাই, আজ ছমাসের পর দিদি শ্বশুরবাড়ী হইতে আসিয়াছে, তাই হরেন্দ্রের কতই আনন্দ! এ আনন্দ তাহার রাখিবার স্থান হইতেছে না। সে কত কথা কহিতেছে—কত কথা শুনিতেছে—তবু যেন তাহার তৃপ্তি হইতেছে না। দুটী একটী করিয়া সরলা কত গল্পই হরেণকে বলিল, কিন্তু তবু হরেণের মন উঠিল না। সে কেবল গল্প শুনিতে চাহিতেছে। সরলা কি করে—তাহার গল্পের ভাণ্ডার শেষ হইয়াছে, তাই তাহার শ্বশুরবাড়ীর ধারে একজন গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছিল, তাহার গল্প তুলিল। হরেণ একটুখানি শুনিয়া বলিল "দিদি, গলায় দড়ি দিলে কি মরণ হয়?" সরলা বলিল "হাঁ।" গল্প শেষ হইয়া গেল। হরেন্দ্র এবার জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি, মরিলে কি হয়?"

সরলা। স্বর্গে যায়।

হরেন্দ্র। স্বর্গ কোথায় দিদি, সকলে কি স্বর্গে যায়?

স। ঐ আকাশে, যেখানে নক্ষত্র উঠিয়াছে। মানুষ ম'রে ঐ সব নক্ষত্র হয়েছে।

হ। ঐ সকল নক্ষত্র কি মানুষ? যে মরে, সেই নক্ষত্র হয়? মা তবে নক্ষত্র হয়েছেন? আমাকে দেখ্‌তে পাচ্ছেন?

সরলার মুখ বিষণ্ণ হইল, মাতৃশোক তাহার হৃদয়ে নবীভূত হইল; অজ্ঞাতে দু এক ফোঁটা অশ্রু তাহার কপোলে গড়াইয়া পড়িল। সরলা একটু নিস্তব্ধ থাকিয়া বলিল, "হাঁ আমাদিগকে তিনি সর্ব্বদা দেখিতেছেন বৈ কি?"

হ। দিদি! মাকে দেখিবার জন্য আমার বড় ইচ্ছা হচ্চে। মা আমাকে দেখিতেছেন, কিন্তু আমি মাকে দেখিতে পাই না কেন? আমার এখানে থাকিতে ইচ্ছা নাই, আমি ওখানে মায়ের কাছে যাব।

স। ছিঃ, ওখানে কি যেতে আছে,—এই সময়ে সরলতার বিমাতা ভাত খাইতে ডাকিল। হরেণকে কোলে করিয়া সরলা তাহার কাছে গেল।

(২)

সরলার বয়স ১২ বৎসর, হরেণ সবে ৬ ছয় বৎসরে পড়িয়াছে। দুই বৎসর হইল সরলার মার ওলাউঠায় মৃত্যু হইয়াছে। সরলার পিতা পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছেন। বিমাতা হরেণকে দেখিতে পারে না। ভাল ভাল খাদ্য দ্রব্য অন্য লোককে দেয়, আপনি খায়, বাপের বাড়ী পাঠায়, কিন্তু হরেণকে দেয় না। কোনও ভাল খেলনা পাইলে নিজের ভাইকে দেয়; ভাল কাপড়, ভাল জুতা সকলই নিজের ভাইটী যাদুর জন্য, হরেণের জন্য কিছুই নয়। ভাইটী কাঁদিলে কত আদর করে, কত ভাল ভাল খেলনা দেয়, কিন্তু হরেণ কাঁদিলে আদর করা দূরের কথা—প্রহারে তাহার অস্থি ভাঙ্গিয়া দেয়। দেখিয়া শুনিয়া হরেণ

আর বড় কাঁদে না, ইচ্ছা হইলেও কিছু চায় না। বিমাতা যা দেয়, তাই খায়, ক্ষুধা পাইলে চুপ করিয়া থাকে, আর সুবিধা পাইলে গোপনে মার জন্য দু চার ফোঁটা চোখের জল ফেলে।

আজ দিদি আসিয়াছে; মার কাছে যাইবার পথও জানিতে পারিয়াছে। তাই হরেণের মনে বড়ই ইচ্ছা হইল—এক বার মার কাছে যায়। আহারাদির পর দিদির কাছে শয়ন করিয়া হরেণ বলিল, "দিদি, চল আমরা মার কাছে যাই। মা আমায় কত ভালবাসিতেন, আমায় কত আদর করিতেন, কেমন ভাল ভাল খাবার দিতেন, কত নূতন নূতন কাপড় জামা দিতেন, কোলে ক'রে কত কথা বলিতেন। এ মা আমাদের ত তেমন করেন না। মা আমায় কখন মারিতেন না। এ মা আমায় মেরে মেরে রোগা করে দেছেন, যাদু আমার খাবার কেড়ে খেলে আমি কাঁদি, কিন্তু এ মা যাদুকে কিছু না ব'লে আমাকেই মারেন, আমি আর এখানে থাক্‌বো না। মা থাকতে বাবা আমায় কত ভালবাসতেন, এখন তিনি আমায় আর তত আদর যত্ন করেন না। দিদি, মার সঙ্গে কি ভালবাসাও স্বর্গে চলে গেছে! তা বেশ, আমিও স্বর্গে যাব! দিদি তুমি যাবে ত? সরলা কোমল হৃদয়ে দারুণ ব্যথা পাইল। কিন্তু তাহা গোপন করিয়া হরেণকে অন্যমনস্ক করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। অন্য কথা বলিতে লাগিল, সাত ভাই সম্পর্কের গল্প আরম্ভ করিল। কিন্তু হরেণ তাহাতে বিরক্ত হইয়া বলিল, "বুঝেছি তুমি যাবে না, মাকে দেখিবার জন্য তোমার একটুও ইচ্ছে নাই।" সরলা চুপ করিয়া রহিল। হরেণও নিস্তব্ধ হইয়া রহিল। ক্রমে রাত্রি অধিক হইল, সরলা নিদ্রিত হইয়া পড়িল।

(৩)

হরেণের আর নিদ্রা হইল না, দিদি ঘুমাইয়াছে দেখিয়া সে বিছানা হইতে উঠিল, দুয়ার খুলিয়া বারাণ্ডায় গেল। একে পূর্ণিমা, তাহে আবার আকাশে একটুও মেঘ নাই—রাত্রি যেন ঠিক দিনের বেলার ন্যায় বোধ হইতেছিল। হরেণ একবার আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল—আবার কি ভাবিয়া ঘরের ভিতর গিয়া মশারির দড়িটী খুলিল। পরে উহা মালার মত করিয়া নিজ গলদেশে পরিয়া আবার বারাণ্ডায় আসিল। কচি হাত দুখানি যুক্ত করিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া রহিল। চন্দ্রদেব নিজসৌন্দর্য্যে হরেণের গৌরাঙ্গের সৌন্দর্য্য শতগুণে বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। তাহার সুন্দর চক্ষু দুটী ছল ছল করিতেছে, সর্ব্ব শরীর কণ্টকিত হইয়াছে, মুখ দিয়া অস্পষ্টে 'মা মা' শব্দ নির্গত হইতেছে।

এক খণ্ড মেঘ আসিয়া অল্পে অল্পে আকাশকে আচ্ছন্ন করিল। হাস্যময়ী প্রকৃতি মলিনা হইয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধরিল। এই সময়ে অদূরে বৃক্ষশাখে এক পেচক বিকট চিৎকার করিয়া উড়িয়া গেল। হরেণ ভীত হইয়া বারাণ্ডায় শুইয়া পড়িল।

সে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, "গলায় দড়ী ত দিয়াছি, আমি কি মরিয়াছি? যদি মরিয়াছি, তবে মার কাছে যাই নাই কেন?"

(৪)

হরেণের বিমাতা দুয়ার খোলার শব্দে শয্যা হইতে উঠিয়া এতক্ষণ হরেণের কার্য্য-কলাপ পর্য্যালোচনা করিতেছিল, কিন্তু কিছুই বুঝিতে না পারায় তাহার কাছে গিয়া স্বভাবসুলভ কর্কশ স্বরে কহিল, "হরা, তুই এখানে শুয়ে কেন রে?" বিমাতার স্বর বুঝিতে পারিয়া ভয়-বিজড়িত স্বরে কহিল, "আমি—আমি মার কাছে যাব, তাই গলায় দড়ী দিয়া মরিতেছি, আর কিছু করি নাই মা, আর কিছু নয়।"

সপত্নী-পুত্রকে শত্রু জ্ঞান করা স্ত্রীলোক-গণের স্বভাবসিদ্ধ কিনা তাহা বলা দুষ্কর, তবে এ দেশের অনেক বিমাতা বিকৃত-ভাবাপন্ন তাহা একটু অনুসন্ধান করিলেই বুঝিতে পারা যায়। হরেণ মরিতেছে শুনিয়া প্রথমে বিমাতার মনে একটু দয়া হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তাহা অন্তর্হিত হইয়া গেল। বিমাতা ভাবিল, হরা ত আর আমার ছেলে নয়, আমার সতীন পো, এ মরে আমার কি? মরে ত বরং ভালই হয়, আমার ছেলে পুলে হলে তারা নিষ্কণ্টকে আমার স্বামীর সমুদায় বিষয় সম্পত্তি ভোগ করিবে। এইরূপ স্থির করিয়াই বিমাতা বলিল, "দূর পাগল, অমন করে কি গলায় দড়ী দেয়?" হরেণ পূর্ব্বে কখন তাহার মুখে এমন নম্র বাক্য শুনে নাই, তাই সাহস করিয়া বলিল, "কেমন করিয়া গলায় দড়ী দেয় বল না মা?" বিমাতা তখন দড়ীগাছটী হরেণের গলা হইতে খুলিয়া লইয়া উহার এক প্রান্তে একটী ফাঁস প্রস্তুত করিল। পরে ঐ ফাঁসটী হরেণের গলায় পরাইয়া দিয়া বলিল, "আমি নিচু হইতেছি, তুমি আমার কাঁধে উঠিয়া বেশ করিয়া বস। যা করিতে হয়, আমি করিতেছি।" বিমাতা হরেণকে কাঁধে লইয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইল এবং দড়ীগাছটীর অপর প্রান্ত চালের সহিত বদ্ধ করিবার জন্য উহা গ্রহণ করিয়া যেমন চালে হাত দিয়াছে, অমনি ফোঁস করিয়া একটা শব্দ হইল। হরেণ ভয়ে "বাবারে মারে" বলিয়া বিমাতার স্কন্ধ হইতে লাফাইয়া পড়িল, বিমাতাও "ও বাবারে জলে মরি" বলিয়া ভূশায়ী হইল। মাতাপুত্রের চিৎকারে বাটীর সকলে জাগ্রত হইয়া দ্রুতপদে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইল। এই সময়ে পবন-তাড়নে ঘনঘটা বিদূরিত হইল। নভঃসরোবরে হীরক কমল হাসিতে লাগিল। প্রকৃতি তাহার হাসিতে হাস্যময়ী। হরেণের পিতা ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "কি হইয়াছে?" বিমাতা মুমূর্ষু স্বরে কহিল, "আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে, আমি নারকী, আমার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে, কাল সাপের বিষে আমার শরীর জ্বলে গেল, আমি মহাপাপী, আমাকে দেখিও না, তোমাদের পাপ হবে।" বিমাতা নীরব